আস্থা

রমাপদ চৌধুরী

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ — ১৯৬৩

প্রকাশক

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী

১৮এ, টেমার লেন

কলকাতা — ৯

মুদ্রাকর

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রিণ্টার্স

১৩৮, বিধান সরণী

কলকাতা — ৪

প্রচ্ছদ

দেবাশীষ রায়

এক

সানাইয়ের সুর থেমে গেছে। অভ্যাগত অতিথিরা আহার পর্ব শেষ করে পানটিকে দাঁতে মাড়িয়ে পা বাড়িয়েছে রাস্তায়। কোলাহলও কমে গেছে।

এখন নাটকের আসল দৃশ্য শুরু হবে। যার জন্য এত আয়োজন, যার জন্য এত কোলাহল, যার জন্য দলে দলে বিভিন্ন উপহার ও ফুলের তোড়া নিয়ে অতিথিরা এই বাড়িতে এসেছিল, যাদের ঘিরে এই অনুষ্ঠান, তাদের এবার গৃহবন্দী করা হবে।

এই অনুষ্ঠানের সবটুকু মজা লোটেন মেয়েমহল। তখন কিন্তু ওরা জাতে এক। তখন কিন্তু মা-মাসি-পিসি, বোনঝি এমনকি নিজের আত্মজারাও বন্ধু হয়ে যায়। এমন সাম্যবাদ কিন্তু কোনো সাম্যবাদী পার্টি বা সংস্কারমুক্ত পুরুষের মাঝেও দেখা যায় না।

আজ সুব্রতর ফুলশয্যা। আহুতিরও। ফুলের সাজে সেজে ফুলের মাঝে মাথাটি দুই হাঁটুর মাঝে গুঁজে বসে আছে আহুতি। ভাবছে কত কথা। তার যে বিয়ে হবে, তাকে যে কোনো পুরুষের প্রয়োজন হতে পারে, সে যে কারও দৃষ্টিতে পড়তে পারে, একথা ভাবতেও সে যখন ভুলে গিয়েছিল, ঠিক সেই সময় পাড়ার পাশের পড়শি দাদার প্রচেষ্টায় এই সাজে সাজবার অধিকার পেয়েছে সে। আজকের সভায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করার সুযোগ পেয়েছে। এর পূর্বে তার জীবনে ছিল দুটি কাজ -- কাজ করতে যাওয়া এবং মাস গেলে পুরো মাইনেটা বাড়িতে এনে দেওয়া। আজ আবার একটি নতুন অভিজ্ঞতার স্বাদ গ্রহণ করতে চলেছে। ভাবতে বেশ লাগছে।

বরকে বিয়ের আগে দেখেনি। সেও মেয়ে দেখতে যায়নি। তবে শুভদৃষ্টির সময়ও চোখের হালকা বাদামি রংয়ের গগলস্‌টা খোলেনি সে। মহিলা মহল থেকে বার বার ওটা খোলার দাবি জানানো সত্ত্বেও ছেলের বন্ধুদের সরব কণ্ঠস্বরে তা চাপা পড়ে গেছে। তারা বলেছে ভয় নেই, ছেলে আমাদের কানা নয়। চশমা ছাড়া চোখে তো অনেক শুভদৃষ্টি হয়েছে—চশমা পরেই না হয় একজনের শুভদৃষ্টির হোক। অন্ততঃ নতুন কিছু হবে। এই ডিস্‌কোর যুগে এটাকে না হয় ডিস্‌কো শুভদৃষ্টির মধ্যে ফেলুন।

একথায় মেয়েমহলে হাসির রোল উঠেছে। এদের বেশ মজাই লেগেছে। চশমা খোলার কথা আর কেউ বলেনি। মেয়েমহল বলতেও সাহস পায়নি। একে তো তাদের পাত্রী গরিব, বয়স্কা, বিগতা যৌবনা। বর্ণ কোনো একসময়ে গৌর ছিল, আজ বর্ণচোরা। মুখের কোলে টোল পড়ে গেছে। কপালে অসংখ্য রেখা। এসবের মাঝেও এখনও যা অবশিষ্ট আছে, তা তার উজ্জ্বল বড় বড় দুটি চোখ, মুক্তার মতো সন্নিবেশিত একই আকারের ঝকঝকে দুপাটি পাইরিয়া বিহীন দাঁত, টিকালো নাক আর মুখশ্রী। এত রোগা যে মেয়েদের অন্যান্য চিহ্ন বিলুপ্ত।

তবুও বিনা বাধায় বিনা হট্টগোলে নির্বিঘ্নে বিবাহের পাঠ চুকে গেছে।

ফুলশয্যার পর্বের সব অনুষ্ঠানও নির্বিঘ্নে মিটে গেছে। অতিথিরা পেটপুরে খেয়ে প্রাণভরে নব-দম্পতিকে আশীর্বাদ করে গেছে। কেউই নিন্দা করেনি। এপর্যন্ত সবারই জিন্দাবাদ ধ্বনি শুনেছে নব-দম্পতি।

সুদর্শন সুব্রতর বয়স যদিও চল্লিশের সীমা পার করেছে। তবুও তার কলপ দেওয়া চুল তাকে আজ ত্রিশ/বত্রিশ বছরের যুবকের আসনে বসিয়েছে।

ঘিয়ে রংয়ের পাঞ্জাবিতে তাকে বেশ মানিয়েছে। সুব্রত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা ব্যারিষ্টার-প্রফেসার নয়। চাকুরিজীবীও নয় আবার বেকারও বলা চলে না। সে নাট্যকার, অভিনেতা ও পরিচালক। তবে সুনামের দরজা এখনও ততটা প্রশস্ত নয়। মাসে গড়ে হাজার পাঁচেক টাকা আসে। আহুতিও চাকুরিজীবী। এতে এদের মোটামুটি চলে যাবে বলে ধরে নিয়েছে। বিয়ের পূর্বে উভয়ের সবরকম বৃত্তান্ত তাদের অভিবাবক মহলে প্রচার করা হয়েছে। বিয়ের পূর্বে কেউ কাউকে না দেখলেও উভয়েই উভয়ের সব কিছু জ্ঞাত হয়েছে।

সুব্রত তার শয্যা গৃহে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে মহিলামহলের যে সভ্যরা এতক্ষণ আজকের রাতের সাম্রাজ্ঞীর চারপাশে বসে হাসি-মস্করার আসর জমিয়েছিল, তারা বেরিয়ে গেল। অবশ্য তারা কেউ বাড়ি যাবে না। দরজার পাশে, জানলার খিড়কির পাশে কান পেতে বসে থাকবে। জীবনের প্রথম পরিচয়ে দম্পতির আলাপের যদি দু-এক টুকরো কথা বাইরে বেরিয়ে আসে। তা নিয়ে পরদিন হাসি মস্করা হবে। আগে এসব মজায় একমাত্র মেয়েদেরই একচেটিয়া অধিকার ও স্পৃহা ছিল -- ছেলেদের নয়। আজকাল ডিস্‌কো যুগে ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গে এসব মজা লুটতে রাত জেগে মশার কামড় পর্যন্ত খায়। এতে এদেরও একটি মজা থাকে। এরা এদের প্রেমিকা বা এই ফুলশয্যা অংশগ্রহণ করতে এসে পরিবেশন করতে গিয়ে, বা অন্য কোনো সূত্র ধরে পরিচয় হবার সম্পর্কটাকে আর একটু ঝালিয়ে নেয়। ঘরের ভিতরে চলে আসল ফুলশয্যা বা শুভরাত্রির অনুষ্ঠান, আর বাইরে তার মহড়া। হাতের মাঝে হাত, গায়ে গা লাগিয়ে বসে থাকা বা কেউ কেউ স্পর্ধার সীমারেখা লঙ্ঘন করে মুখের স্বাদ নেওয়ার চেষ্টাও করে। বাইরে এরূপ একটি মহড়া হচ্ছিল। আর ঘরের মাঝে তখন বাতি না নিভিয়েই নবোঢ়ার গালের দুপাশে দুখানা হাত দিয়ে অবনত মুখটাকে নিজের দিকে নায়োকচিত চালে তুলে ধরতে সচেষ্ট হল সুব্রত।

নায়িকা অর্থাৎ সহধর্মিণী আহুতি অঙ্গুলি সঞ্চালনে চোখের পর্দা অর্থাৎ রঙিন চশমা খুলে ফেলার নির্দেশ দিল।

আজ দুজন দুজনকে সম্পূর্ণরূপে জানার দিন। কেউ কোথাও নেই। আছে শুধু জিরো পাওয়ারের একটি ইলেকট্রিক বালব্‌, ফুলে ঢাকা শয্যা। আর তারা দুজন। দুদিন আগেও যারা কেউ কাউকে দেখেনি, কথা বলেনি, পরিচিত হবার সুযোগ ঘটেনি, আজ তারা সরব হবে। মিলেমিশে একাকার হবে।

সুব্রত আজ আর আপত্তি জানায় না রঙিন চশমা খুলতে। সে চায় তার সহধর্মিণী তাকে ভালো করে দেখুক, চিনুক, জানুক।

চশমা খুলে সুব্রত তার চোখ দুটি আহুতির চোখের পরে তুলে ধরতেই পদমর্যাদার পর্দা সরে গেল আহুতির। আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠল সে। দুহাতের বন্ধন থেকে ছিটকে দূরে সরে গেল সুব্রতকে ধাক্কা দিয়ে।

প্রথমটায় সুব্রত একটু মুষড়ে পড়ল। তারপর মোলায়েম স্বরে বলল-- আমি জানতাম এরকমই ঘটবে। আমি জানতাম।

— জানতেন! তো একটি মেয়ের জীবন নষ্ট করতে এপথ বেছে নিলেন কেন? ঐ বীভৎস চোখের দিকে কোনো মেয়েই তাকাতে পারে না। একজন নাট্যকার ও চরিত্রাভিনেতা হয়ে যখন তা জানতেনই, তখন কেন আমার এতদিনের স্বপ্নকে সমাধিস্থ করলেন? কি দোষ করেছিলাম আমি? কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে আহুতি।

এই দিনটিকে ঘিরে মেয়েরা স্বপ্ন দেখতে শুরু করে প্রথম ঋতুমতী হবার সময় থেকেই। কত পুঞ্জিত অভিমান, সঞ্চিত কথা তাদের জমে থাকে। যে ভাবনা সেই প্রথম যুবতী হবার সময় থেকে সঞ্চিত হতে থাকে, তা উজাড় করে দিয়ে হালকা হয় এইদিনে। কিন্তু কাকে সে সব উজাড় করে দেবে? এক ঘৃন্য প্রতারককে? যা'র একটি চোখ নেই। আর কি বীভৎস সেই চোখটা। কেউ যেন খাবলে খেয়ে নিয়েছে। সারাজীবন একটা কানার সঙ্গে জীবন কাটানোর চেয়ে চিরকুমারী থাকাই তো ভালো ছিল। আর এই শৌখিন লোকটাই বা কি ধড়িবাজ, চোখে চশমা এঁটে ফুল বাবুটি সেজে থাকে।

এদিকে দবজার ও জানালার পাশে যারা এতক্ষণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল, কোনো রোমান্টিক দৃশ্য ও রোমান্স মাখা ডায়লগ্ শোনার আশায় গাঢ়তর হয়েছিল তাদেরও মোহভঙ্গ হল। এমনটা যে হবে; রোমান্টিক পর্বে কান্না শোনা যাবে তা তারা ভাবেনি। এ যে অভিনব ঘটনা।

* * *

শুনতে অসম্ভব অথচ দেখতে স্বাভাবিক এরকম ঘটনা নিয়তই তো ঘটছে। আর মনের সেই বিচিত্র গতি নিয়েই তো সাহিত্যিকের কারবার।

কান্নার বেগ খানিকটা প্রশমিত হলে গাঢ় স্বরে সুব্রত বলতে থাকে –– দেখুন, আমি এ চাইনি। আমি বিয়ে করতেই চাইনি। আমি আমার বন্ধু, দিদি, বোন ও মাকে বলেছিলাম আমাকে কেউ সহ্য করতে পারবে না। কানা স্বামী কোনো মেয়ের কাম্য নয়। কিন্তু ওরা আমাকে বুঝিয়েছিল যে, তোর চোখটা কানা কিন্তু তোর হৃদয়, তোর মানসিকতা, তোর প্রেম, সে তো মিথ্যা নয়। তোর জীবনের এই পরিণতির জন্য যারা দায়ী, তাদের সে ইতিহাস শুনলে নিশ্চয়ই সহৃদয়া কোনো নারী তোকে গ্রহণ করতে কোনোরকম কার্পণ্য দেখাবে না।

— তারা বলল, আর আপনি ন্যাকা খোকার মতো তাতে সায় দিলেন? একটা মেয়ের সর্বনাশ করলেন? এই আপনি নাট্যকার নায়ক? ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল আহুতির কণ্ঠে।

এতটুকু অসহিষ্ণুতা ও অধৈর্য পরিলক্ষিত হল না সুব্রতর অবয়বে, শান্ত স্বরে সে বলল — আহুতিদেবী! আমার জীবনের এই পরিণতির ইতিহাস ঐ খাতা খানায় সহজভাবে লেখা আছে। যদি ইচ্ছে হয়, তবে তা পড়বেন, আর যদি তা না করেন, তবে দয়া করে আর একটা উপকার করবেন। আজকের রাতটা কোনো রকমে এখানে কাটিয়ে কালই দ্বিরাগমন পর্ব্বের অজুহাতে বাড়ি যাবেন। আর আপনার সুবিধা আছে। আপনি চাকরিজীবী। বলবেন, আপনার ছুটি পাওনা নেই। আগামী পরশু জয়েন্ট করতে হবে। দেখুন মা বড় আশা করে আমায় বিয়ে দিয়েছেন। আমার একান্ত অনুরোধ তার মনে যেন কোনো আঘাত না লাগে।

ফোঁস করে উঠল আহুতি — আপনি তো বড় স্বার্থপর। আপনার মা-র কথা চিন্তা করছেন, আর আমার দরিদ্র পিতা-মাতার কথা ভাবছেন না? তাঁরা মেয়ের এই পরিণতির কথা শুনলে কি বলবেন? তাঁদের মানসিক অবস্থা কি হবে?

— তাহলে আপনি আমায় কি করতে বলেন?

— আপনি তো একজন অভিনেতা?

— লোকে তো তাই বলে।

— তাহলে আজ থেকে আর একবার সংসারে থেকেই সেই অভিনয় করুন। আমরা উভয়ে স্বামী স্ত্রী রূপে থাকব কিন্তু আমাদের শয্যা আলাদা থাকবে। আশা করি আপনার দ্বারা আমার শালীনতা হানি হবে না।

— দেখুন, আমি অভিনেতা হলেও চরিত্রহীন, লম্পট নই। তাই অপরিচিতা রমণীর সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার একজন ভদ্রলোক করে থাকে — সেরূপ আচরণই আপনি পাবেন। তবে বাইরে যেন কেউ এটা বুঝতে না পারে।

— বেশ।

সোফা-কাম-বেডে আশ্রয় নিল সুব্রত তার স্বপ্নের বুকে কুঠার হেনে আর বুকের চাপা কান্না চেপে নিয়ে ফুলের বিছানায় মুখ গুঁজে পড়ে থাকল আহুতি।

এপাশ-ওপাশ করে কিছুসময় কাটাল। আলো জ্বেলে একবার জলও খেল।

জলপানের পর বিছানায় শুতে যাবে হঠাৎ একটা ডায়রি দেখতে পেল আহুতি, যেটাতে আছে সে যার সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়েছে তার জীবনের এক অজানা অধ্যায়।

কৌতূহলটা মেয়েদের বরাবরই একটু বেশি। তারা মুখে বলে আমি ভাই মরা কাটা দেখতে পারি না। কারও কান্না শুনলে আমার কান্না পেয়ে যায়, যে মেয়ে একথা বলে তাকেই দেখা যায় রেলে কেউ কাটা পড়লে বা কোনো ব্যক্তি খুন হলে সেখানে আগে ছুটে যেতে। যে বলে সে পাড়া বেড়াতে ভালো বাসে না, সে বেশি পাড়া বেড়ায়। আহুতিও সেই

সংস্কার মুক্ত হতে পারল না। কৌতূহলকে দমন করতে না পেরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুব্রতর জীবনলিপি তুলে নিল।

ঝকঝকে মুক্তার মতো অক্ষর। জীবনী নয়। কাহিনি।

দুই

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে বসে আছি তখন, করবার মতো কোনো কাজ খুঁজে না পেয়ে ঠিক করলাম নাটক করব।গ্রামের দিকে তখন শখের নাটকে নায়িকা পাওয়া খুবই কষ্টকর ছিল।

আমাদের গ্রামও তখন সে প্রভাব মুক্ত ছিল না। তাই নায়িকার সন্ধান চলল বেশ কিছুদিন। অবশেষে সে সমস্যার সমাধান হল।

আমাদের বাড়ির পাশে একঘর ভাড়াটে ছিল। তাদের ঘরে পাঁচটি মেয়েঁ। বড়টির এল. এম (লাভ ম্যারেজ) হয়েছে। মেজটি সবে বারো পেরিয়ে তেরোতে পা দিয়েছে। গায়ের রং কালো, যুগ্ম ভ্রু, চোখ দুটো বড় বড় ও উজ্জ্বল। তা লোকের দৃষ্টি কাড়ে। তাকে পাওয়া গেল নায়িকা রূপে।

মেয়েটির নাম শ্রদ্ধা। তার আচার আচরণ, চাউনি — চলাফেরা এবং বার বার আমাদের বাড়িতে আনাগোনায় বোঝা গেল শ্রদ্ধা আমাকে শ্রদ্ধা করে।

আমি বাইরে আড্ডা মারা পছন্দ করি না, তাই সে স্কুল ও বাড়ি ছাড়া কোনো জায়গায় যায় না। পোষাকে অত্যাধুনিকতাকে আমি প্রীতির নজরে দেখি না ও তাই খুব সাধারণ পোষাকে থাকে। যখন যা বলি তাই করে। আমার অবসর জীবনের অনেকটা সময় কেটে যায় শ্রদ্ধার সহচর্যে।

এমন সময় একটা চান্স পেলাম। কোলকাতায় ছয়ের এলাকায় একটি প্রেসে থাকব ও খাব বিনিময়ে তাদের প্রুফ দেখব আর কলেজে পড়ব।

অনেক স্বপ্ন নিয়ে কোলকাতায় গেলাম ভর্তি হলাম কলেজে। প্রুফ দেখা ও কয়েকটি টিউশানিও যোগাড় করলাম।

সেই সময় অনেকদিন বাদে বাড়িতে ফিরেছি। বসে আছি নিজেদের বাড়ির রকে। অদূরে কয়লার গুঁড়ো দিয়ে গুল দিচ্ছে শ্রদ্ধা। আমি তার বাড়ন্ত শরীরের দিকে তাকিয়ে আছি। দুজনে ছোটখাট দু একটা কথা বলছি। এমন সময় তার মা আসায় আমাদের কথায় বাঁধা পড়ল।

ভদ্রমহিলার নাম স্নেহময়ী হলে কি হবে, নিজের সন্তান ছাড়া তার কারও প্রতি স্নেহ ছিল না। তিনি একথা সে কথার পর আমায় বললেন — বাবা তুই তো কোইলকাতায় থাকস্। দেখিস তো আমাদের মাইয়াটার জন্য কোনো ভালো পোলা পাস কীনা?

— কিন্তু মাসিমা, ওতো সবে এইটে পড়ে। ওকে অন্তত স্কুল ফাইনাল পাস করতে দিন। তাছাড়া পাস করলে তো ও আপনার পাশে এসে দাঁড়াতে পারবে।

— আমি মাইয়ার কামাই খাইতে চাই না। পোলায় যদি না খাওয়ায় তো নিজের ক্ষমতায়

আজ যেমন এদের খাওয়াইতাছি! তেমন নিজের প্যাটও চালামু।

ভদ্রমহিলা একটি হাসপাতালে আয়ার কাজ করেন। তার ছেলে আমার বন্ধু।

আমি সায় দিলাম। বললাম -- বেশ আমি চেষ্টা করব।

সে সময়ের মতো কথায় ছেদ পড়ল। স্নেহময়ীদেবীও নাইট ডিউটিতে বেরিয়ে পড়লেন।

* * *

অনেকদিন পর বাড়িতে ফিরেছি। তাই পাড়ার পরিচিত মহলে ঘুরে বেড়ালাম কিছু সময়। কবে এলাম এ প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে বিরক্ত হয়ে অবশেষে শ্রদ্ধাদের ঘরে ঢুকলাম।

দেখলাম তার অন্য তিন বোন ও ছোট ভাই পড়ছে আর সে ঘরের ঘেরা বারান্দায় রন্ধনের কাজে ব্যস্ত রয়েছে।

ওদের পড়ার বিষয়ে দুচারটে প্রশ্ন করে এলাম সেই রন্ধনশালাতে।

আমায় দেখেও ও মুখ ফেরালো না। খুব ব্যস্ত হয়ে তরকারিতে খুন্তি দিয়ে নাড়া দিতে লাগল।

আমি আসন না গ্রহণ করেই ওকে উদ্দেশ্য করে বললাম-- কীরে, পড়াশোনা কি ছেড়ে দিলি?

ও রান্নার কড়াই নামিয়ে রেখে আমার প্রশ্নের উত্তরে বলল-- পড়াশুনা করে আর কি হবে। তোমরা তো আমাকে পার করার ব্যবস্থা করছ?

-- আরে চেষ্টা করলেই কী আর এখনই পাত্র পাওয়া যাচ্ছে? আর কেউ দেখতে এলেই কি বিয়ে হয়ে যায়?

-- আর কারও হয় কীনা জানি না। তবে আমার হবে।

-- কি করে বুঝলি?

-- তুমি যে কাজেই হাত দাও, তার সুরাহা হয়। এই কথা বলে আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে আমার বুকের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। কেন তুমি পারো না আমার ভার নিতে?

একুশ বছরের যুবকের বুকে পনেরো বছরের মেয়ের স্পর্শের স্বাদ যে কি ভয়ানক বিপর্যয় ঘটাতে পারে তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। আমার বুকের মাঝে পনেরো বছরের ফুটন্ত যৌবন ওঠা নামা করছে দ্রুতালয়ে। ইচ্ছে দুটি হাতের মাঝে চেপে ধরে স্পন্দনকে স্তব্ধ করি। কিন্তু অত সাহস কোথায়? মাঘ মাসের শীতেও ঘামতে লাগলাম। কিছু সময় লাগল সুস্থ হতে। প্রকৃতস্থ হয়ে দুহাতে ওর মুখখানা তুলে ধরে আবেগ মথিত স্বরে বললাম -- শ্রদ্ধা আজ থেকে তোমার সব ভার আমার।

শ্রদ্ধা আবারও একটি দুঃসাহসিক অভিযানে অগ্রসর হল আমার ঠোঁটের স্বাদ নিয়ে। এমন মধুর স্বাদও পৃথিবীতে আছে? একটি মেয়ের ঠোঁটের স্পর্শের স্বাদ এমন মধুর। ও

ঘরে চলে গেল। আমি বাড়িতে ফিরে এলাম। আশ্রয় নিলাম বিছানায় কিন্তু ঘুম এলো না। বারবার শ্রদ্ধার পরশ আমাকে অভিভূত করল।

পরদিন ফিরে এলাম কোলকাতায়। কিন্তু কাজে মনোযোগী হতে পারলাম না। আমার তখন শ্রদ্ধা ছাড়া আর কোনো কিছু মনে পড়ছে না। ওর অধরের সঙ্গে অধর মেলাতে, ওর ফুটন্ত যৌবনের উষ্ণ সান্নিধ্য পেতে, আমি অস্থির হয়ে উঠলাম।

ঐ কালো মেয়েটির মনেও এই ছিল? ও থিয়েটারের নায়িকা থেকে আমার জীবন সঙ্গিনী হতে চেয়েছিল?

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই চেতনা থাকে, মাথা চাড়া দিয়ে বেড়ে ওঠার সুযোগ না পেলে তখনকার মতো মুষড়ে থাকে মাত্র। বাইরের কোনো কিছু না জানতে দিলেও সে সজাগ হয়ে বেঁচে থাকে। কোনো দিকে কিছুমাত্র ফাঁক দেখলেই সে তখন সেই দিকেই ঠেলে বেরোতে চায়। বাধা পেলে আবার তখনই গুটিয়ে যায়। এমন অবস্থায় পড়লে অনেকের সারা জীবনে হয়তো কোনো ফাঁকই মেলে না, যে অবস্থায় এসে থেমে গেছে সেই অবস্থায় তাদের সারা জীবন কেটে যায়, যেমন একটা জলপ্রবাহ রুদ্ধ হয়ে গেলে ডোবায়, পুকুরে পরিণত হয় -- কিন্তু জল মরে না। আবার যদি কোনো খোলা জায়গা পায় তবে সবেগে সেই জল আবার বইতে শুরু করে।

আমি আমার সুপ্ত বাসনাকে শুকিয়ে যেতে দিতে চাইলাম না। পরিণামের চিন্তা না করে ঝট্ করে আমার বন্ধুকে তার বোনকে বিয়ে করতে চাই এই প্রস্তাব দিয়ে পত্র লিখলাম।

আমি ভেবেছিলাম যারা দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় না। আমার যে বন্ধুর পরীক্ষার ফি এই বাড়ি থেকে দেওয়া হয় -- টিফিন এই বাড়ি থেকে যায়, সে এই প্রস্তাবে হাতে স্বর্গ পাবে। কিন্তু তার উত্তর এল অতি কঠোর ভাষায়ঃ

পত্রের বক্তব্য এইরূপ --- সামান্য নব্বই টাকার চাকরি করে তুমি এমন প্রস্তাব দেবার সাহস করলে কি করে? আর কয়েকটা টাকা বেশি পেলে কি করতে? বন্ধু হিসাবে তোমাকে কয়েকটা উপদেশ দেই। এসব বাজে চিন্তা ছেড়ে মা-বাপ ভাই-বোনদের প্রতি দৃষ্টি দাও। ঐ কটা পয়সায় তোমার একারই চলবে না। আর ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে কথা বলা বা মেশার চেষ্টা করো না —

এ চিঠি যদি কোনো ধনীর কন্যার পানিগ্রহণের প্রস্তাব দেবার উত্তরে পেতাম, তবে মনে কোনো ক্ষোভ থাকত না। কিন্তু চিঠি এল আমার চেয়েও হীন অবস্থাসম্পন্ন এক ব্যক্তির কাছ থেকে যে তিনটি বছর আমার সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে কাটিয়েছে। কোলকাতায় আসবার আগে যাকে আমার টিউশানিগুলি দিয়ে এসছিলাম, সেই বেইমান অকৃতজ্ঞের কাছ থেকে। এ সেই বন্ধু যাকে অবৈধ সম্পর্কের শিকার হতে দেখেও তার সম্মান রাখতে চুপ করে ছিলাম।

অকৃতজ্ঞ বেইমান ও পশুর আচরণ পেয়ে মনটা একদিকে বিক্ষিপ্ত হল, অন্যদিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে আর যোগাযোগ থাকবে না ভেবে অস্থির হয়ে উঠলাম। সারারাত কেটে গেল বেইমানী ও ভালোবাসার দোলনায় দুলে। পরে ভারসাম্য হারিয়ে জ্ঞান হারালাম।

আত্মীয় পরিজন শূন্য পরিবেশে এই বেদনার সাক্ষী কেউ থাকল না। এখানকার আমার শুভানুধ্যায়ীরা আমাকে ভর্তি করে দিল হাসপাতালে। সুস্থ হয়ে বাড়িতে গেলাম।

আমি আসবার আগেই আমার সব ঘটনা বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়ে গেছে।

আমি কান্না ভেজা গলায় আমার মাকে বললাম ---মা, আমি বিয়ে করব। তোমরা চেষ্টা করে দেখো।

মা ঠাট্টার সুরে বললেন -- বিয়ে করবি, খাওয়াবি কি ? আর এই বয়সে আমাদের বংশে কেউ বিয়ে করে না। সিনেমা দেখে দেখে আর নভেল পড়ে নভেলি ছাঁদ হয়েছে। তোর বাবা শুনলে যে অনর্থ ঘটাবে।

আমার বেদনায় সাড়া দেবার মতো কাউকে পেলাম না। মনের ব্যথা মনের মাঝে চেপে অপমানের জ্বালা যন্ত্রণা বুকের মাঝে নিয়ে ফিরে এলাম কর্মস্থানে।

এসেই পেলাম একটি চিঠি। চিঠিটি নিম্নরূপ ঃ

Kali

শ্রদ্ধাস্পদেষু --

কী দিয়ে যে চিঠিটা আরম্ভ করি বুঝতে পারছি না, ভাষা হারিয়ে ফেলেছি, কিন্তু উপায় নেই লিখতে হবে। কেননা যে ব্যক্তি আমার মতো একটা নগণ্য মেয়ের জন্য তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছে, তাকে আমার পক্ষ থেকেও কিছু বলার আছে। তার উন্নতির পথে অগ্রসর হবার জন্য আমি প্রেরণা যোগাতে চাই, জানি না কতটা সফলতা অর্জন করব।

আমার জীবনে পুরুষের কাছে পত্র এই প্রথম। তাই হয়তো অনেক ভুল ক্রটি থেকে থাকবে। আশা করি ক্ষমা করে নেবে। শুরুতেই জানিয়ে রাখলাম।

আমি তিন সত্যি করে বলছি আমি তোমায় ভালোবাসতাম, ভালোবাসি -- অদূর ভবিষ্যতেও বাসব। এর বেশি আজ আর কিছু বলতে পারছি না। কারণ স্বাধীন মত প্রকাশ করে কোনো কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার মতো দুঃসাহস আমার নেই। প্রণাম নিও। ধৈর্য্য ধরো। সময়ে সব হবে।

ইতি -- তোমারই "শ্রদ্ধা"

তিন

শ্রদ্ধা যে আমায় ভালোবাসে এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে আবার কর্মযোগী হলাম। এরপর কেটে গেল আরও দুটি বছর।

শ্রদ্ধা তৃতীয় বিভাগে স্কুল ফাইনাল পাশ করে কলেজে ভর্তি হল। চেহারা, সাজসজ্জা পল্টাল। ওরা অন্য বাড়িতে উঠে গেল।

আমার সাথে দেখাসাক্ষাৎ হয়। মনের মাঝে তখন ভীষণ জ্বালা। ওর দাদার তখন কর্মে উন্নতি হয়েছে। ওর মায়ের গর্ব বেড়েছে। আমাদের সম্পর্কের বিষয়ে কথা উঠলে ভদ্রমহিলা ঠোঁট উলটে বলেন যে, ঐ ছেলেকে আমার মেয়ে প্রচন্ডভাবে ঘৃণা করে। দেখলেই মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

এমন কথা শুনলে কার না রাগ হয়? কার না ইচ্ছে করে সেই মেয়েটির জবাবদিহি করতে যে, কেন তুমি তখন বুকের মাঝে পড়ে মুখের স্বাদ গ্রহণ করে নিজেকে প্রকাশ করেছিলে? কেন পত্র দিয়ে প্রেরণা জুগিয়েছিলে?

ধৈর্য্য হারিয়ে ওর মাসতুতো দাদার হাতে ওকে একটি পত্র লিখলাম। ওর বিহনে আমার মানসিক অবস্থা, আর ও নাকি আমাকে ঘৃণা করে, ও যা তা বলে তাও উল্লেখ করলাম।

পত্রের জবাব এল পরদিন। চিঠিটি নিম্নরূপ —

Kali

শ্রীষ্পদেষু —

দীর্ঘদিন বাদে তোমার পত্র পেয়ে আমার মানসিক অবস্থা শ্রাবণের পূর্ণিমার মতো হয়েছে। ভনিতা না করে তোমার পত্রের উত্তরে জিজ্ঞেস করি — তুমি লিখেছ যে, আমি তোমায় ঘৃণা করি। এ কথাটা কার কাছ থেকে শুনেছ? হয়তো আগের মতোই ভালোবাসি। হয়তো কেন সত্যিই ভালোবাসি। তারপর আরও লিখেছ যে, আমি তোমায় গালাগালি দিয়েছি। কিন্তু আমার মনে পড়ে না যে, আমার মুখ থেকে কবে ঐ ধরনের কথা বেরিয়েছিল। ঐরূপ অশ্রদ্ধার শব্দ মুখ থেকে বার হবার আগে যেন আমাব মৃত্যু হয়। তুমি যে আমার আত্মার আত্মীয়। আত্মীয়কে কি কেউ অবজ্ঞা করতে পারে?

আমায় তুমি শাস্তি দিতে পার না লিখেছ, কিন্তু আমার মতে আমি বেশ শাস্তি পাচ্ছি। কেননা একটি ছেলের অবনতির কারণ যদি একমাত্র আমি হয়ে থাকি, তবে আমি কি করে পড়াশুনাতে মন দিই, এটা কি আমার পক্ষে কম শাস্তি?

কিন্তু আমি তা হতে দেব না। কিছুতেই না। আমার জন্য একজন এমনিভাবে তুষের আগুনে জ্বলতে জ্বলতে ক্রমশ ক্ষয়ের পথে এগিয়ে যাবে, আর আমি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকব। তা হবে না। তোমাকে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতেই হবে। দেখো, পৃথিবীর সর্বত্রই এই চাওয়া পাওয়া

এবং পাওয়াটা ঠিক ভাবে না পেলেই তখন না পাওয়ার ব্যথাটা বেশি করে বাজে। কিন্তু তাই বলে কি এমনি অবসন্ন হয়ে পড়তে হবে? পৃথিবীতে সবাই কি যা চায় তাই পায়? মানুষের জীবনের উন্নতিব পথে কত বাধা বিপত্তি সমস্যা দেখা যায়, যে এইসব অবলীলাক্রমে মাড়িয়ে চলে যেতে পারে, সেই হয় চিরজয়ী। মনকে দৃঢ় বন্ধনে বাঁধতে হবে। এমন শিথিল হলে চলবে না। নিশ্চয়ই জীবনে উন্নতি করতে হবে। দশজনের মাঝে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। উপদেশ নয়, অনুরোধ একান্ত অনুরোধ। মনের জড়তা গ্লানি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও। একদিন হয়তো আশা পূর্ণ হবে। তুমি আমায় এত যে গভীরভাবে মনে প্রাণে ভালোবাস, কৈ তা তো, কোনোদিন ঘুণাক্ষরেও জানতে দাওনি। তোমার মন খুবই দুর্বল জানি। কিন্তু তুমি যাকে নিয়ে আশার সৌধ রচনা করেছিলে তাকে কি একবারও জানাতে নেই? যাক আমি তোমায় ঘৃণার চোখে দেখিনি। দেখবও না। তোমায় ভালোবাসতাম, আজও বাসি, বাসবও। তোমার দুঃখে আমিও কম দুঃখিত নই। তোমার পত্রখানা পড়তে পারছিলাম না। বুক ব্যথায় ভরে উঠেছিল। যার জন্য আজ কলেজ পর্যন্ত যেতে পারলাম না। কিন্তু কি করব?

দেখো, তুমি পুরুষ। তোমার পক্ষে এত দুর্বল হলে চলে না। পুরুষোচিত মনোভাব নিয়ে কর্মক্ষেত্রে গা ভাসিয়ে দাও। একদিন ঠিকই কূল পাবে। আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন তোমার ভালোবাসা অমর হয়ে থাকবে। তোমাকেও বাঁচতে হবে বাঁচার মতো করে। ছন্নছাড়া পথিকের মতো ঘুরলে চলবে না। পাওয়ার ব্যথাটা বড় করে দেখলে হবে না। মনে শান্তি আনার চেষ্টা করো।

আমাব স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হতে বলেছ, কিন্তু তোমার নিজের স্বাস্থ্যর দিকে একবার চেয়ে দেখো তো। আমি যথেষ্ট ওষুধ পথ্য খাচ্ছি -- এ শরীর হয়তো সারবার নয়। তোমার স্বাস্থ্যেব দিকে নজর দাও। মনের আবর্জনা দূর করতে পারলেই স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। মনে শান্তি খুঁজে পেলেই স্বাস্থ্য ভালো হবে। মনে শান্তি আনো। স্বাস্থ্য ফেরাতে হবে। আমার কাশি তো সেরে গেছে। আমার চিন্তা কমিয়ে নিজের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দাও।

অনেক কিছুই ভাবছিলাম, কিন্তু লেখনীতে আসছে না। পত্রটা ছন্দহীন হয়ে পড়ছে। বুঝে পড়ে নিও। হয়তো উপদেশের সুরই বেশি। কিন্তু এটা জানবে যে উপদেশ নয় -- একান্ত অনুরোধ। আবারও বলছি এভাবে মনকে কষ্ট না দিয়ে স্থির লক্ষ্য পানে এগিয়ে যাও -- সফলতা অর্জন করতে পারবে।

আচ্ছা আমার কষ্টে নাকি তোমারও কষ্ট, তাই যদি হয় তবে কেন যে এতগুলো কথা লিখে আমার মনে কষ্ট দিলে বুঝতে পারলাম না। ভেবেছিলে আমি আনন্দ পাব, তাই না? আমার প্রতি তোমার ভ্রান্ত ধারণাগুলি মুছে ফেল। এ ছাড়া যদি তাই হয় যে, মনের দুঃখের কথা একজনকে না বললে শান্তি পাওয়া যায় মা, তাই আমাকে এতগুলি কথা লিখেছ, তাহলে মনটাকে প্রবোধ দিতে পারি। কাল চিঠিটা পড়ার পর থেকে নিজের শরীরটাকে আরও দুর্বল মনে করছি।

চিঠিতে অনেক আজে বাজে কথা এবং বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। ক্ষমা প্রার্থনীয়। আন্তরিক ভালোবাসা রইল -- আর রইল সশ্রদ্ধ প্রণাম। ইতি

তোমার -- "শ্রদ্ধা"

চার

এরপর শ্রদ্ধার সঙ্গে আমার মেলামেশার আর কোনো বাধা রইল না।

আমি তখন ইন্টার মিডিয়েট পাশ করে বাংলায় অনার্স নিয়ে বি. এ পড়ছি। কলেজের সোসাল ফাংশানে যথারীতি অংশ গ্রহণ করছি এবং আমার লেখা দু একটি নাটক অভিনয়ও হচ্ছে।

বাড়ি থেকেই তখন ডেলি প্যাসেঞ্জারি করছি। কারণ শ্রমিকপক্ষ মানে যারা একের পর এক অক্ষর গেঁথে গেঁথে বইয়ের পাতা তৈরি করে এবং যারা কালির রোলারের মেসিনে সেগুলি ছেপে প্রকাশ করে, তাদের পক্ষ সমর্থন করায় প্রেসের কাজ ছাড়লাম। কোলকাতায় যাই কয়েকটি টিউশানী করতে। যখন ফিরি তখন মাঝে মাঝে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

সে তখন প্রতিদিন তার বাড়ির পাশের দুটি মেয়ের সঙ্গে বিকেলে বেড়াতে বের হত। সীমানা অবশ্য খুব বেশি নয়। পাড়ার এ মাথা থেকে ও মাথা ও স্টেশানের প্লাটফর্ম।

আমায় দেখতে পেয়েই সে ইচ্ছে করে ওদের থেকে পেছিয়ে পড়ত।

একদিন চুলে শ্যাম্পু করেছি, রুক্ষ, উস্কো চুল। কোলকাতা থেকে ঐ অবস্থায় ফিরছি। ও অনেক দূর থেকে আমায় দেখে ওদের থেকে পেছিয়ে পড়ল। আমি কাছে আসতেই মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল — তোমার কি হয়েছে?

— কিছুই না

— কিছু না তো চেহারার এ হাল কেন?

— আমি আবার মোটা ছিলাম কবে যে, আজ মোটা হব?

— বুঝলাম, আমার রুক্ষ চুল দেখে ও এই কথা বলছে। ওর কন্ঠের এই স্নেহমাখা স্বর আমাকে অনাস্বাদিত জগতে নিয়ে গেল। কেউ যে আমার কথা চিন্তা করে, আমার অসুস্থতার খবরে উদ্বেগ প্রকাশ করে এটা ভাবায় যে কি আনন্দ তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কোনো তরুণী যদি কোনো তরুণের জন্য এরূপ উদ্বেগ প্রকাশ করে, তবে তো কথাই নেই। তবে তার জন্য তো জীবনও দেওয়া যায়।

তখন আমি প্রায় সময়ই ওকে একবার চোখের দেখা দেখতে চাইতাম। যেদিন স্টেশানে বা পথে ঘাটে ওকে দেখতাম না, সেদিন আর রাতে ভালো করে ঘুম হোত না। এভাবে দু তিন দিন কেটে যাবার পর ওকে খুঁজতে ওদের পাড়ায় যেতাম।

এমনই একদিন ওদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে দেখলাম ও ওদের বাড়ির বিপরীত দিকের একটি মাটির দেওয়াল যুক্ত টালির চালের ছাউনির বাড়ির ভিতর ঢুকছে।

কিছুক্ষণ পর ঐ পথ দিয়ে ফিরতে গিয়ে দেখি ও বসে রয়েছে ঐ বাড়ির একটি মাত্র ছেলে যতীনের সঙ্গে। বাড়িতে যতীন ও তার বৃদ্ধা মা। যতীন বয়সে আমার চেয়ে বড়। কাজ করে একটি মিলে।

পরদিন আবারও বিকেলে ওদের বাড়িতে ওর সঙ্গে বসে গল্প করতে দেখলাম শ্রদ্ধাকে। বুকের স্পন্দন দ্রুত হল। মনে হতে লাগল প্রাণটা বুঝি বেরিয়ে যাবে।

এরই ইংরাজি নাম বোধহয় জেলাসী বা ঈর্ষা। ওকে সন্দেহ করছি একথা বলা যাবে না, তাহলে সম্পর্কে ছেদ পড়বে, আবার এদৃশ্যও দেখা যাবে না।

আবারও রাতের ঘুম সুদূর পারাপারে পাড়ি জমাল।

দীর্ঘদিন ওর সঙ্গে দেখা নেই, মনের ইচ্ছা ওকে ঐ বাড়ির আবহাওয়া থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাই।

এসব কিছুই হল না। শেষ পর্যন্ত আমার একটি নাটক ছাপা হচ্ছিল --- তার দুটি ফর্মা আমি ওকে পড়তে দিলাম পথে ওর দেখা পেয়ে। কয়েকদিন বাদে দেখি যে যতীনের সঙ্গে আমার কোনো আলাপ নেই, সে আমাকে তার বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেল। তার মায়ের হাতে গড়া রুটি তরকারি খাওয়ালো এবং আমার হাতে শ্রদ্ধাকে যে ছাপা ফর্মা দুটি দিয়েছিলাম তা দিয়ে বলল --- শ্রদ্ধা এটা তোমাকে দিতে বলেছে। একথা বলেই বলল -- আচ্ছা হঠাৎ ওকে এটা পড়তে দিলে কেন?

-- ও খুশি হবে সেইজন্য।

-- কিন্তু এত লোক থাকতে ওকেই বা দিলে কেন?

-- তোমাকে কি তার জবাবদিহি করতে হবে?

জোরের সঙ্গে একথা বলাতে যতীন থতোমতো খেয়ে গেল। তারপর বলল -- ও বুঝেছি। কিন্তু দুটো জীবন নিয়ে আমি এভাবে ছিনিমিনি খেলতে দেব না।

কথাটা আবারও হৃদয়ে আঘাত হানল। দুটো জীবন বলতে যতীন নিজেকে বোঝাতে চাইছে। তাহলে আমার অনুমানই ঠিক। শ্রদ্ধা তাহলে ওকে কথা দিয়েছে আবার আমাকেও সহানুভূতিপূর্ণ চিঠি লিখে ভুলিয়ে রাখছে।

আমি তখন বেশ heat দিয়ে যতীন আমাকে যা বলেছে এবং লেখাটা তার হাত দিয়ে ফেরৎ পেলাম কেন সে বিষয়ে পত্র লিখলাম। উত্তর পেলাম আমার অনুমান মতোই।

Kali

সুপ্রিয়বরেষু --

সর্বপ্রথম তুমি আমার বিজয়ার প্রণাম নিও। তারপর আজ সকালে তোমার পত্রখানা পেলাম। তোমার কথামতো ভালো করে পড়লাম। চিঠিটা পড়ে আমার মনের অবস্থা যে কি হয়েছিল তা আর তোমার শোনার প্রয়োজন নেই। চিঠিতে কি লেখা ছিল তা নিয়ে আমি তর্ক বা কোনো বোঝাপড়া করতেও অবতীর্ণ হইনি। কেবলমাত্র কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করবার জন্য এই পত্রের

অবতারণা করতে হল। মাত্র কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব। আচ্ছা এবারে বল সভয়ে না নির্ভয়ে বলব? অবশ্য বলতে যখন বসেছি তখন কি আর তোমার কথার অপেক্ষায় থাকব কি বলো? নির্ভয়েই সব বলে যাব। নাঃ, ভূমিকাটা বড় বেশি হয়ে যাচ্ছে। এখনই হয়তো চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দেবে। যাক এবারে ভূমিকা বাদ দিয়ে আসল কথায় আসা যাক, যা লিখেছি একটু ভালো করে পড়ো কেমন?

আচ্ছা তুমি আমাকে কি ভেবেছ বলতে পার? এই যে বার বার তুমি আমায় heat দিয়ে যতীনের কথা লিখেছ, একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছ বহুবার। যেমন -- তোমার অন্তরঙ্গ দাদা, তোমার দাদা, তোমার শ্রদ্ধেয় দাদা, এসবের মানে কি? একজনের সঙ্গে কথা বললেই কি সে অন্তরঙ্গ হয়ে যায়? আর সেটা তুমি বুঝলেই বা কি করে? ও আমি তোমার সেই বইটা ওর হাতে দিয়েছিলাম তাই।

শোনো, আমি অনেক চেষ্টা করেও যখন তোমার হাতে বইটা দিতে পারলাম না, তখন বাধ্য হয়েই ওর হাতে বইটা দিয়ে বলেছিলাম যে, আপনার সাথে তো ওর দেখা হয়, এই বইটা ছিল, ওকে দিয়ে দেবেন তো? তখন কিন্তু ও একবারও জিজ্ঞেস করেনি যে, তোমার বই আমার কাছে কেন? কিন্তু তুমি আমার পরে রাগ করে ওকে এসব কথা বললে। জানি না এতে তোমার কি লাভ হল? লক্ষীটি! একটা কথা স্থির জেনো আমার ভালোবাসা, সহানুভূতি ক্ষণিকের মোহ নয়, চিরস্থায়ী। জীবনে তোমার সঙ্গে আমার পরিণয় নাও হতে পারে কিন্তু ভালোবাসা, শ্রদ্ধা আমরণ থাকবে। পরিণয় হতে পারে না শুনে একটু হতাশ হলে তাই না? দেখো, আমাদের বাড়ির কেউই তোমাকে সাদরে গ্রহণ করবে না। এ আমি নিশ্চিত জানি। কারণ তাদের আলাপ আলোচনা ও হাবভাবে বোঝা যায় — তারা কেউই তোমার প্রতি অনুরক্ত নয়। আর তোমাদের বাড়ির কেউই আমাকে পছন্দ করে না - এটাও আমি বুঝতে পেরেছি। এরূপ অবস্থায় আমাদের বিয়েটা কীরূপে সম্ভব? তুমি আমার আত্মার আত্মীয়। আত্মার আত্মীয়কে কখনো আমি সকলের কাছে অপমানিত হতে দিতে পারি না। তাই এ বিয়েতে এখনই মত দিতে পারছি না। কি ফল হবে এতে? হয়তো দুজনকেই অশান্তির আগুনে জ্বলে পুড়ে মরতে হবে। এরূপ বিয়ের আমি কোন Value খুঁজে পাই না। তুমি আমাকে হয়তো খুবই স্বার্থপর ভাবছ। কিন্তু ভেবে দেখো এ সম্ভব কীনা? তুমি হয়তো খুবই অধৈর্য হয়ে পড়েছ। ধৈর্য্য ধরো লক্ষীটি ধৈর্য হারিও না। শান্ত হও। আমি বুঝতে পারছি, তোমার মনে আজ প্রলয় ঝড় বয়ে যাবে। কিন্তু তাই বলে অন্য কিছু করে বোসো না যেন। এই সামান্য ব্যপারে বাড়ি ছাড়া বা অন্য কোনো কিছু করাকে আমি কাপুরুষতা বলে মনে করি। কেন তুমি পূর্বে যেভাবে ছিলে এখনও কি সেইভাবে থাকতে পার না? পূর্বে মানে বন্ধু বিচ্ছেদের পর থেকে প্রথম চিঠি দেবার আগে পর্যন্ত। তাছাড়া তোমার সৃষ্ট নাটকে তো তুমি কখনো কোনো জীবনকে নষ্ট হতে দাওনি। তুমি হয়তো বলবে বইয়ে যা থাকে বাস্তবে কি তাই হয়? কিন্তু আমি বলব তোমার ঐ নাটকে তোমার মনের অভিব্যক্তি স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। বাস্তবেও তাই হবে, দেখবে পরে মনের পরিবর্তন আসবে। লক্ষ্মীটি! আমার কথা শোনো। কোনোদিনও প্রত্যেকে প্রত্যেকের ইপ্সিত বস্তু লাভ করতে পারে না। এজন্মে যদি না হয় পরজন্মে না হয় হবে। ভেবে

ভেবে আর শরীর নষ্ট করো না। আর কেউ বলুক না বলুক, আমি বলছি তোমার উন্নতি হবেই। আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি। বাড়ি ছাড়বে না। যেখানেই যাও আর যাই করো আমায় না জানিয়ে যাবে না বা করবে না। আমার মাথার দিব্যি রইল। বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে অন্য কোথাও কি শান্তি পাবে? দুঃখ করো না লক্ষ্মীটি। অনুরোধ রেখো। প্রণাম নিও। আমায় ক্ষমা করো।

ইতি তোমারই 'শ্রদ্ধা'

পাঁচ

চিঠিটা পড়ে রাগে - দুঃখে শোকে মনের অজান্তে নিঃশব্দে বিছানায় শুয়ে চোখের জলে বালিশ ভিজল। এ বেদনার সাক্ষী কেউ থাকল না। বুঝলাম একটা অধ্যায় শেষ হল। এবার নতুন কিছু ভাবতে হবে।

এ চিঠির আমি কোনো উত্তর দিলাম না। চারদিন বাড়ির বাইরেও বের হলাম না।

আরও দুদিন কেটে গেল। শ্রদ্ধাকে একটিবার চোখের দেখা না দেখে থাকতে পারলাম না। সন্ধে হতেই ওদের বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম।

রাস্তা পার হবার মুখে যতীনের বাড়ির দিকে তাকালাম। সেখানে ওকে দেখলাম না। পাড়ার শেষ প্রান্তে গিয়ে ফিরে আসছি হঠাৎ অন্ধকারের মাঝে পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল— এই শুনছ। আমি না শোনার ভান করে চলে যেতে চাইলাম। কি আশ্চর্য যাকে খুঁজতে; একবার চোখের দেখা দেখতে এতদূরে এলাম সে ডাকছে অথচ সে ডাকে সাড়া দিতে মন সায় দিচ্ছে না।

ও এবার আমার সামনে এসে দাঁড়াল — কি গো শুনতে পাচ্ছ না? রাগ করেছ? আমার সঙ্গে কথা বলবে না? কান্না ভেজা কাকুতি মাখানো কাতর কণ্ঠকে উপেক্ষা করে যাবার মতো মানসিক অবস্থা আমার ছিল না। তাছাড়া আমি তো এটাই চাইছিলাম। ওর দিকে না ফিরে বেশ গাম্ভীর্যপূর্ণ স্বরে বললাম — বলো, কি বলতে চাও?

— তুমি কাল একবার আমাদের বাড়িতে আসতে পারবে?

— কেন? তার কি আর কোনো প্রয়োজন আছে?

— তোমার না থাকতে পারে আমার আছে।

— কেন, তোমার দাদা ও মাকে দিয়ে অপমান করাতে চাও?

— দ্যাখো তুমি তা ভাবতে পারো। কিন্তু আমার প্রাণ থাকতে কেউ তোমাকে অপমান করতে পারবে না। আমার দাদা বা মা তোমাকে অপমান করবে এমন কাজ তোমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হলে আমি আত্মহত্যা করব।

— তাহলে আমাকে ডাকছ কেন?

— কেন ডাকছি তা এলে বলব। তুমি আসবে কীনা?

— বাড়িতে কেউ থাকবে না তো?

— না।

— সব যাবে কোথায়?

— দাদা যাদবপুরে। মা কাজে। মিত্রা যাবে হাসপাতালে আর নিপুকে দিদির বাড়ি পাঠাব।

-- বেশ আমি যাব। তা কখন আসব?

— সকাল সাতটার পর।

দীর্ঘদিন বাদে একান্তে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের বাড়িতে মিলিত হব। জীবনে বোধহয় এই প্রথম একটি ঘরের একটি কামরায় মিলিত হব আমি আর আমার প্রেমিকা শ্রদ্ধা।

বুঝলাম আমাকে ঐরূপ পত্র লিখে ওর মনে যে অনুশোচনা এসেছে তার ভার লাঘব করতে ও আমাকে ডেকেছে। ও আমাকেও দুঃখ দিতে চায় না। আবার বাড়ির লোকেরও মন রাখতে চায়।

একটা নতুন অভিজ্ঞতার স্বাদ নিতে চলেছি কাল এই আনন্দে সারারাত ঘুম হল না। ভোরের দিকে বারবার ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসতে চাইল। জোর করে তাদের দূরে সরিয়ে দিয়ে উঠে পড়লাম।

প্রাতঃরাশ সেরে ঠিক সাড়ে সাতটার সময় ওদের বাড়ির দিকে যাত্রা করলাম।

ওদের এই বাড়িতে আমি কোনোদিন যাইনি। টালির চাল ও কঞ্চিকে মাটি দিয়ে মুড়ে বেড়া দেওয়া বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ির দূরত্ব একটি স্কুল মাঠ। জায়গাটা পরের অনুগ্রহে পাওয়া।

গেটের কাছে ও দাঁড়িয়েইছিল। আমি আসতেই ঘরের দিকে পা বাড়াল। আমি ওকে অনুসরণ করলাম। ঘরে ছোট্ট একটা খাট। আর আসবাব পত্র নেই বললেই চলে। খাটের গোটানো বিছানায় পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছে শ্রদ্ধা, আমাকেও আমন্ত্রণ জানাল ওব পাশে বসতে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম আমি। ভাবছি ও কিছু বলুক । আর ও বোধহয় ভাবছে আমি কিছু বলব। ওর পাশে বসে থাকতে ভালো লাগছে। ইচ্ছে করছে ওর একটা হাতকে হাতের মাঝে নিয়ে কাতর কণ্ঠে বলি -- শ্রদ্ধা আমায় ছেড়ে যেও না। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।

কিন্তু বাস্তবে তা হল না। কোনোরূপ সিনেমার সিনক্রিয়েট না করে শ্রদ্ধাই প্রথমে বলল -- তুমি কি আমার পরে রাগ করেছ?

-- রাগ কি যার তার পরে করা যায়? রাগতস্বরে বললাম।

— আমি কি তোমার কাছে যা তা?

-- দ্যাখো তুমিই প্রথমে তোমার মনোভাব ব্যক্ত করেছিলে। আমি তাকে সমর্থন করেছিলাম। তোমাকে দিতে চেয়েছিলাম সেই সম্মান, যে সম্মানে ভূষিতা হতে প্রতিটি নারী চায়। কিন্তু তুমি আমাকে এগিয়ে দিয়ে এমন ভাব দেখাচ্ছ, যেন তুমি তোমার দাদা ও মায়ের বাধ্য মেয়ে। তাদের অমতে কিছুই কোনোদিন করনি।

— সেদিন আমি আচমকা যা করেছিলাম সেটা আমার সাময়িক আবেগ নয় চিরস্থায়ী

সিদ্ধান্ত। কিন্তু হয়তো তাকে রূপ দিতে ব্যর্থ হয়েছি। দ্যাখো, আমার মা ও দাদা যদি আমাকে বুড়োর হাতেও দেয়, তাকেই আমি মেনে নেব। কিন্তু তাই বলে ভালোবাসার অমর্যাদা হতে দেব না।

-- এ তো বেশ ভালো কথা। তুমি সেই পর্দানসীন যুগের মেয়েদের মতো কথা বললে। তোমার মতো কলেজে পড়া আধুনিকাদের মুখে একথা শোভা পায় না। তবে দ্যাখো, তুমি যদি তোমার অভিভাবকের মত ও পথকে পাথেয় করে তাদের মতানুসারে চল— তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু যদি তুমি আমার মতো আর কারও সঙ্গে প্রণয়াসক্ত হও — তখন কিন্তু বিপর্যয় হবে। এখন তাহলে আমি যাই।

হঠাৎ ফোঁপানির শব্দ কানে এল। শ্রদ্ধা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে দেখতে পেলাম।

এই কান্নাকে উপেক্ষা করে বাইরে বেরিয়ে যেতে গিয়েও পারলাম না। কাছে গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে মোলায়েম স্বরে বললাম — এতে কান্নার কি হল? তুমি তোমার অবিভাবকের অমতে কিছু করতে পারবে না। ভুলবশত সাহস দেখিয়েছিলে, এখন পেছিয়ে পড়ছ। এতে অন্যায় কোথায়? তোমার মতো বহু মেয়েই এমন করে থাকে। অনেক পুরুষ একে মেনে নেয়। আবার কেউ কেউ একে মেনে নিতে না পেরে নায়িকার পর রিভেঞ্জ নেয় — আবার কেউ কেউ কাপুরষোচিত কর্মে লিপ্ত হয়ে আত্মহত্যাও করে। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমি এর কোনোটাই করব না। তুমি সুখী হও এটাই আমার কাম্য।

ফোঁপানি থেমে গেল, কান্না ভেজা স্বরে শ্রদ্ধা জিজ্ঞেস করল — চা খাবে?

-- না।

— কেন, আমার হাতে চা খেতে ঘৃণা বোধ হচ্ছে।

— তোমাকে যদি ঘৃণা করতে পারতাম তাহলে তো জীবনে কোনো দুঃখই ছিল না। কিন্তু যে আমাকে চায় না — আমার জন্য আত্মত্যাগ করতে পারে না, তার কথা ভেবে অস্থির হতে হবে এবং সারাজীবন তার জায়গায় আর কাউকে বসাতে পারব না এটাই যা দুঃখ। বলেই আমি ওদের ঘর ছেড়ে বাইরে বের হতে সচেষ্ট হলাম।

বাধা পেলাম।

শ্রদ্ধা দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আমায় সেই ভাবে বাধা দিল যেমন করে শরৎচন্দ্রের দেবদাসের নায়িকা পার্বতী দেবদাসকে বাধা দিয়েছিল। মুখের সংলাপও সেইরূপ — এই ঘর ছাড়বার আগে তোমাকে একটা কথা দিতে হবে।

— যদি সে কথা রাখা আমার সাধ্যে কুলায়, তবে তা অবশ্যই রাখব।

— তাহলে আমায় কথা দিয়ে যাও, তুমি বিয়ে করে ঘর বাঁধবে, আর আমার কথা ভুলে যাবে।

— তোমাকে ভুলে যাওয়া আর আত্মহত্যা করা আমার পক্ষে একই। তাই একথা রাখা

সম্ভব নয়। দ্যাখো মানুষের মনের ইচ্ছা যেখানে অন্যের ইচ্ছার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে চায়, অন্যের চাওয়ার ওপর নির্ভর করতে চায়, তখনই সে ইচ্ছার আর স্বাধীন অস্তিত্ব থাকে না। তখন সে পরাধীন। আর একটা সত্য কথা তোমায় জানাই। এই পৃথিবীটা একটা রহস্যময়। মানুষ এখানে একজন একজনকে সহজে চিনতে চায় না। কিন্তু একবার চিনলে আর সহজে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। হয়তো কাছে টানে, নয়তো দূরে ঠেলে। কিন্তু সারা জীবনে আর তাকে ত্যাগ করতে পারে না। সুখে-দুঃখে, হতাশায়-নিরাশায় সে বার বার ফিরে ফিরে আসে, দারিদ্র্যের নিঃসঙ্গতায় ফিরে আসে, বিলাসের প্রাচুর্যেও ফিরে আসে। এখানে এত কোটি কোটি মানুষ। মানুষের স্পর্শ বাঁচাতে মানুষ অস্থির। তবু এই মানুষের জন্যই মানুষের মন বড় কেমন করে। মানুষ সেই মানুষকেই চায় ফিরে ফিরে।

এমন সময় বাইরে শ্রদ্ধার ছোটো বোন ডাকল — মেজদি।

তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে শ্রদ্ধা নিপুকে দশ পয়সা দিয়ে দোকানে লজেন্স খেতে পাঠাল — যাতে সে আমাকে এই বাড়িতে দেখেছে তা না বলে দেয়। ব্যাপারটা আমার খুব খারাপ লাগল। কারণ মিথ্যাচার আমার ভালো লাগে না।

পরদিন ওদের বাড়ির পথে যাবার সময় দেখলাম ও দাঁড়িয়ে আছে ওদের বাড়ির গেটের কাছে, আমি রাস্তা পার হতে ও বলল — জানো নিপু মাকে কিছু বলেনি।

আমি 'হ্যাঁ' বা 'না' কিছু না বলেই দ্রুত চলে গেলাম।

ছয়

সব সম্পর্কের পরে দাড়ি টেনে দিয়ে বাড়িতে ফিরে এলাম। কোলকাতায় আর যেতে পারলাম না। শ্রদ্ধার কান্না ভেজা মুখখানা বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠে মনটা দুর্বল করে দিল। সারাদিন আর বাড়ির বাইরে পা রাখলাম না। বিকেলে কে যেন জোর করে আমায় টেনে নিয়ে গেল ও পাড়ায়। দেখি শ্রদ্ধাদের বাড়ির সামনে একটি কলাগাছের ঝোপে গোলটেবিল বৈঠক বসিয়েছে যতীন, শ্রদ্ধা ও তার আর দুই বান্ধবী।

— দেখলাম বেশ হাসি ঠাট্রায় মেতে উঠেছে শ্রদ্ধা। কিন্তু আমি কাছে আসতেই রৌদ্রজ্বল আবহাওয়ায় ঘনঘটা ছেয়ে এল। আমি ওদের জগতে বেশিক্ষণ বিরাজ করলাম না। যেমন পথ দিয়ে যচ্ছিলাম, তেমনি চলে গেলাম। এটাই প্রমাণ করতে চাইলাম যে আমি এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম।

এরপরদিন ছিল ওদের কলেজের Social , আমার মেজবোন সেই কলেজে ওর সতীর্থ। তাই বোনের অভিভাবক হিসাবে আমিও গেলাম সেই ফাংশানে। এখানে না গেলেই বোধ হয় ভালো হত। অবশ্য না গেলে একজনের আসল চরিত্র বুঝতাম কি করে? কি করে দেখতে পেতাম নারীর দশটি রূপের পরিচয়?

দেখলাম আমার শ্রদ্ধাকে। আমার কল্পলোকের ধ্রুবতারাকে। অন্যরূপে, অন্য সাজে -- অন্য মেজাজে। যদিও আমার মেজবোনের মুখে ওর সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছিলাম — কিন্তু বিশ্বাস করিনি।

আজ সত্য প্রকটিত হল।

কালো মেয়েটি পেইন্ট করে সাদা হয়েছে — চোখে কাজল, কপালে টিপ, ঠোঁটে লিপস্টিক তো আছেই। তার উপরে যে মেয়েটি সাত চড়ে কথা বলত না। অতি শান্ত, অতি মৃদু স্বরে কথা বলার জন্য তাকে সকলে প্রশংসা করত, আজ দেখলাম সে হয়েছে এই ফাংশানের মক্ষিরানি। তার ঐ উগ্রসাজ, ইতর শ্রেণীর মেয়েদের মতো আচরণ, আমার ধমনীতে জ্বালা ধরিয়ে দিল। ও যেখানে বসে আছে তার দুপাশে দুটি ছেলে। সুকুমার ও অনুপকুমার বলে যারা পরিচিত। ওর সহপাঠীও তারা নয়। ও পড়ে পি. ইউ আর ছেলে দুটি থার্ড ইয়ারে। আমি শুনেছিলাম ও প্রায়ই কলেজ পালিয়ে সিনেমায় যায়। তা এমন সাথী পেলে কে না যায়?

অনুষ্ঠান শেষ হল রাত সাড়ে এগারোটায়। আমি আমার বোনের সঙ্গে আসছি। আগে ও আর ওকে ঘিরে একদঙ্গল ছেলে। পথে আসতে আসতে রাস্তায় একটা বিয়ে বাড়ির প্যাণ্ডেল দেখে ও বলল — আরে চল ওখানে পাত পাতি। বড্ড খিদে লেগেছে। বলে রাস্তায় পাতা একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

পেছনে যে আমি আছি তা ভুলে গেল। গাড়িতে ওর সহপাঠিনী শিপ্রা যে ওর পাড়াতেই থাকে, সে কিন্তু নিশ্চুপ। আর আমার বোনের তো কথাই নেই। গোটা গাড়ির কামরায় সারাক্ষণ ও বক্‌বক্ করল ঐ ছেলেগুলোর সঙ্গে। কখনো তাদের গায়ে পড়ে কখনো তারাও ওর গায়ে পড়ে। গন্তব্যস্থলে এসে ছেলে দুটি বলে -- কিরে শ্রদ্ধা পৌঁছে দিতে হবে?

শ্রদ্ধা জবাব দিল — দরকার নেই। লোক আছে। ভাবলাম আমার অস্তিত্ব বোধহয় এতক্ষণ ওর মনে পড়েছে। স্টেশানে নেমে দেখি শিপ্রার এক আত্মীয় দাঁড়িয়ে আছে। ওরা তিনজন চলে গেল, আমি ফিরে এলাম বাড়ি।

সারারাত দুটো চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। এই মেয়েকে ঘিরে কত স্বপ্ন দেখেছিলাম। ওর গুণের প্রশংসা করতাম। ওর জন্য বন্ধু বিচ্ছেদ হল। ও দেখছি এক পাকা অভিনেত্রী।

মনের ভাব মনের মাঝে চেপে রাখার অভ্যাস নেই আমার। তাই তা ফুটে উঠল কাগজে - কলমে। পত্র লিখে ওর কলেজে যাবার পথে ওর হাতে দিলাম। সে চিঠি দেবার পদ্ধতিও অপূর্ব। ও যে ট্রেনে কলেজে যেত আমিও সেই ট্রেনে যেতাম, তাবে এক কামরায় কখনো নয়।

সেদিন উঠলাম এবং ওর হাতে খামখানা ওর বান্ধবীর সামনে দিয়ে বললাম-- মায়ার বেতন ও আজ যাবে না, তুমি দিয়ে দিও।

ও পরম যত্নে খামটি নিয়ে বইয়ের ভিতর রাখল। ঐ চিঠিতে যে ভাবে ওকে আক্রমণ আর কটুক্তি বর্ষণ করেছিলাম তাতে কোনো শিক্ষিতা মহিলা আর ঐ পত্রের উত্তর দিত না। আমি সবশেষে একটা কথা লিখেছিলাম, যদিও তোমার কোনো কথা আমি বিশ্বাস করি না, কোনো কথা শুনতে চাই না। আর জানি এরপরে তুমি কোনোদিন আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে না। তবুও যদি তোমার কিছু বলার থাকে একটা থেকে দুটোর মধ্যে বালি স্টেশানে অপেক্ষা করবে।

এটা ছিল আমার একটা পরীক্ষা। ও যদি আমায় ভালোবাসে তবে নিশ্চয়ই আমার জন্য বালিতে অপেক্ষা করবে। আর যদি কাল ওকে যেরূপে প্রত্যক্ষ করেছি ওটাই ওর আসল রূপ হয়, তবে আর কোনো যোগাযোগ থাকবে না।

আমি অন্যমনস্কভাবে সেদিন যে ট্রেনটায় উঠেছিলাম সেটির ঐ স্টেশনে কোনো স্টপেজ ছিল না। ফলে আমি বাড়িতে চলে আসি এই ধারণা নিয়ে যে ও আর আমায় পত্র দেবে না। সেদিন এবং তার পরের দিন আর ওপাড়ায় গেলাম না। দুদিন বাদে গিয়ে আমার জ্যেঠতুতো বৌদির হাত থেকে পেলাম ষোলপাতার এক বিরাট পত্র। খামে ভরা নয়। খোলা। বৌদি সেই চিঠিখানা আমার হাতে দিয়ে বলল — আচ্ছা তোমরা এমন কেন বলোতো?

— কি রকম ?

— একটা মেয়েকে একটা জায়গায় অপেক্ষা করতে বলে গেলে না। ও তো তোমার কথা বলতে বলতে কেঁদে ভাসাল।

আচ্ছা বৌদি তুমিও তো মেয়ে — দাদা ও মায়ের আপত্তি সত্ত্বেও তোমার চেয়ে ডবল বয়সের কম টাকা আয়ের ছেলেকে বিয়ে করেছে।

— করেছি। তাতে কি হয়েছে? যাকে ভালোবাসি, বিয়ে করব বলে কথা দিয়েছি, তাকে বিয়ে করেছি।

— বেশ, তাহলে বলোতো ঐ মেয়েটা আমায় ভালোবাসে কীনা?

— আমার তো মনে হয় বাসে। তবে আমরা গ্রামের মুখ্য মেয়ে আর ও কলেজে পড়া মেয়ে। ওদের হয়তো অন্যরকম হতে পারে।

— চিঠিটা পড়েছ?

— না, পরের চিঠি পড়ার স্পৃহা আমার নেই। তবে ও যে ভাবে কান্নাকাটি করল, তাতে তো মনে হয় ভালোবাসে।

আমি বাড়িতে ফেরার আগে ওকে দেখলাম ঐ বাড়ির সামনে দিয়ে গেল, একা।

বাড়ি গিয়ে চিঠি খুললাম।

চিঠিটা নিম্নরূপ ----

Kali

সুপ্রিয়বরেষু —

তবে কি আমাকে শুধু একটু শাস্তি দেবার জন্যই বালি স্টেশনে নিয়ে গিয়েছিলে? তা না হলে তোমার এরকম মারাত্মক ভুল হয়, তা তো কোনোদিনও শুনিনি। একজনকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে দিব্যি বাড়িতে বসে আছ, আর আমি ওদিকে বোকার মতো ঘোরাঘুরি করছিলাম। দুটো ক্লাস না করে চলে এসেছিলাম। তবে হ্যাঁ, অপরাধের তুলনায় শাস্তি তেমন কিছুই হয়নি কি বলো? আরও বেশি শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল। নেহাত ভালো মানুষ বলে একটু রেহাই পেলাম। তা শুধু কি শাস্তি দেওয়াটাই উদ্দেশ্য ছিল? না, একটু পরীক্ষা করলে আমাকে? তবে আজ ওখানে আমার সঙ্গে দেখা হলে খুব ভালো হোত, অনেক কথা বলার ছিল। তাছাড়া দেখা হলে আর এই পত্রের অবতারণা করে তোমায় বিরক্ত করতে হোত না। এবার আসল কথায় আসা যাক। অভিনেত্রীর কাজই তো শুধু অভিনয় করে সকলকে মুগ্ধ করা তাই তো? সেই হিসাবে তোমার দেওয়া উপাধিটা ভালোই হয়েছে আমার পক্ষে। তুমি তো আমাকে একান্তভাবে ভালোবেসে কিছুই পাওনি দুঃখ ছাড়া, তবে আমি কিন্তু আমাকে যে ভালোবাসে তার কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছি — শুনবে নাকি? আর কিছু না হোক অনেক উপাধি পেয়েছি। যথা -- অভিনেত্রী, প্রতারক, পুরুষঘেঁষা, অতিসস্তা, সাধারণ, আধুনিকা, লোফার, আড্ডাবাজ, শিক্ষিতা আরও কত

কি। তবে এগুলো হালে দেওয়া। তার পূর্বে যা পেয়েছিলাম -- সেগুলো হচ্ছে, অনন্যা, অসাধারণ, সুচরিতা, শুচিস্মিতা, অবিস্মরণীয়াসু প্রভৃতি। এগুলোর পরিবর্তে এখন প্রথমোক্ত উপাধিগুলোই আমার পক্ষে নাকি প্রযোজ্য। আচ্ছা ভালোই, তবে এখন অভিনয় পটীয়সী নারীরও যে কয়েকটি কথা বলার ছিল, কিন্তু ভয় হচ্ছে তা কি বিশ্বাস করবে? ভয়ের কারণ অভিনেত্রীর কাজ তো শুধু অভিনয় করা, তাই যদি এখানেও অভিনয়ই করে তাই হয়তো সব বিশ্বাস করবে না। কিন্তু শোনো অভিনেত্রীরাও মানুষ, তারা সর্বত্রই অভিনয় করে না। সুতরাং আমাকে এখন একটুক্ষণের জন্য বড় একটা অভিনেত্রী না মনে করে একটি সাধারণ মেয়ে ভেবে যা লিখছি তা মন দিয়ে পড় এবং বিশ্বাস কর। দ্যাখো একটা কথা, তোমাকে আমি আজ পর্যন্ত একটাও মিথ্যা কথা বলেছি বলে মনে পড়ে না। তাই আশা করি, আমার কথা মিথ্যা ভেবে উড়িয়ে দেবে না।

আচ্ছা, এবারে একটা একটা করে তোমার পত্রের উত্তর দেই। সেদিন অর্থাৎ কালীপূজার পরদিন শনিবার সাড়ে আটটায় আমাকে ও মিত্রাকে যেতে দেখলে, আমরা গেছলাম কোন্নগরে একটা দরকারে। আর তুমি বললে কীনা আমি একটা ছেলের সঙ্গে দেখো করতে গেছলাম --তাও বোধহয় দেখা নয় শোনা কথা। তাছাড়া আমাদের সঙ্গে যে ছেলেটি এল আমাদের বাড়িতে, সে আর কেউ নয়, আমাদেরই আত্মীয়, স্টেশানে তার সঙ্গে দেখা হতে তাকে বাড়িতে নিয়ে আসি। সে হচ্ছে আমার যে পিসির এখানে বিয়ে হয়েছে তার দেওর। আর সে তো প্রায়ই আসে আমাদের বাড়ি। আর আমি যদি একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ করতেই যেতাম, তবে কি আর মিত্রাকে সঙ্গে নিতাম? আর কি? না উগ্রসাজ?

আমার উগ্রসাজ দেখে চমকে গিয়েছিলে তাই না? আচ্ছা একটু স্নো পাউডার আর যেদিন ইচ্ছে হয় একটু টিপ্ ব্যাস্। এটাকে যদি বল উগ্রসাজ! সাধারণত সব মেয়েরাই এগুলো মাখে। কেন তোমার বোনদের কি স্নো পাউডার মাখতে দেখনি?

তুমি আমাকে রাস্তার অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে তুলনা দিলে। সামান্য একটু স্নো-পাউডারেই যদি উগ্রসাজ হয়, তবে তাদের সেই লিপস্টিক তারপর আরও কতরকম পেইন্ট করবার জিনিস সেইসব নামও জানি না সেগুলো মাখলে কি বলতে? তবে অবশ্য সেই সব কোনোওদিন পছন্দ করি না। সত্যি আমি সামান্য একটু স্নো পাউডার ছাড়া আর কিছুই ব্যবহার করি না। আর কুমকুমের টিপও তো সবসময় দিই না। মাঝে মাঝে দিই। আমি ভাবতে পারিনি কোনোদিন যে, আমি এমন সাজ সাজব যা লোকের চোখে লাগবে আর তারা আমার সাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে। ছিঃ ছিঃ এর থেকে লজ্জার আর আমার কিছু নেই।

তারপর লিখেছ যে, বন্ধুপ্রীতি এমনই যে Waiting room-এ গিয়ে কাপড় পালটিয়ে পরি। কলেজ পালিয়ে সিনেমা দেখি। আমি অবাক হয়ে গেছলাম এই সব কথা কে বলে? আর তুমিও আমায় এইসব ভাবলে কি করে? শোনো আমি কালীর দিব্যি দিয়ে বলছি কোনো দিন Waiting room-এ গিয়ে কাপড় ছেড়ে পরিনি আর কলেজ পালিয়ে সিনেমাও দেখিনি। জানো, আমার একটু চেঁচিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে, তবে যদি মনে একটু শান্তি পেতাম। কলেজ থেকে দুটো বই দেখি দুটোই বুধবার। কারণ বুধবারে ২-১৫তে ছুটি। আর দুদিনই শেষের ক্লাস হয়নি, স্যার আসেনি বলে। আর হিন্দি বই আমি পছন্দ করি না কোনোকালেই, শুধু লোকের পাল্লায় পড়ে যাওয়া।

আর দেখো সুকুমার আমাকে logic বুঝিয়ে দিতে আসেনি। এসেছিল এমনি বেড়াতে। আর একটা কথা তোমার আমি কিছুই বুঝলাম না, ঐ যে লিখেছ। তোমার লেখাটাই আমি তুলে দিচ্ছি, আর সেই মেয়েটির পাশেই বসেছিল তোলা ফটকের মাল ছেলে শশীবাবু মুরারী, যার পরিচয় তোমার মা দিয়েছেন তোমার কাকা বলে।

কে লোকটি? কি বৃত্তান্ত কিছুই বুঝলাম না। একটু পরিষ্কার করে বলবে লক্ষ্মীটি? বলবে তো?

আচ্ছা এবার অন্য পর্যায়ে চল। তোমরা যে কারণে মায়াকে ফটো তুলতে দাওনি সেই কারণটা তো আমি আগে জানতাম না, যদি তোমার এত অমত ছিল তবে কেন আমাকে আগে জানাওনি? তারপর দেখতে আমি ফটো তুলি কীনা? রঞ্জুর ব্যাপার কি আমি কিছু জানতাম? সুন্দরের ব্যাপারটা শুনেছিলাম বটে, কিন্তু সেই রঞ্জুই যে এই রঞ্জু তা কি করে জানব? ফটো তোলার পর বাড়িতে দেখাবার পর তো শুনলাম ওরই কীর্তি এইসব। দাদা ও মা বারণ করে দিল ওর সাথে বেশি মিশতে। কিন্তু আগে আমি না জেনে সকলের সাথে মিশেছি — কি করে জানব? তোমরা যদি এতই জানো, তবে আগে কেন সাবধান করনি আমাকে? এখন যে খুব heat দিয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু লিখছ? কে বলল, ও আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু? একসঙ্গে যেতে হয় যাই। তাই বলে অন্তরঙ্গ হয়ে গেল দুদিনেই? কথাটা জানার পর থেকে ওর সাথে কথা বলার প্রবৃত্তিও আমার নেই। কিন্তু পারি না থাকতে বলতে হয় তাই বলি। আর একটা কথা শুনে আমার সবচেয়ে দুঃখ হয়েছে যে, আমি নাকি বলেছি নীলুদা ও যিশুর আমার পরে নজর পড়েছে। ছিঃ ছিঃ, নীলুদা-কে সত্যি আমি দাদার মতো শ্রদ্ধা করি, যিশুটাকে কেন যেন দেখতে পারি না। ওর চাউনি আমার দেহে বিষ ঢেলে দেয়। কিন্তু আমি এমন কথা কখনো বলিনি। এমন কথা আমার মনেও আসেনি কোনোদিন। যতীন বলেছে তো এই সব কথা? আর তোমার ও আমার ব্যাপারটা নীলুদা ও যিশুকে কি যতীনই বলেছে না তুমি বলছ? লক্ষ্মীটি! সত্যি করে বলো তোমার প্রিয়জনের দিব্যি রইল। যে বলেছে তার নাম বলবে। ও যদি বলে তবে এই কথাটা আমি ওকে জিজ্ঞাসা করব। সত্যি বলছি। আর যদি তুমি বল, তবে আর আমার করার কিছু নেই। আত্মার আত্মীয়ের সঙ্গে তো আর বিরোধ চলে না।

রঞ্জুর সঙ্গে একসঙ্গে কলেজে যাই বলে রঞ্জুর টাইপের মেয়ে আমাকে ভাবতে পারার কোনো কারণ নেই। কলেজে যাই করি না কেন, বাইরে কে কবে দেখেছে ছেলেদের নিয়ে ঘুরতে? স্টেশানেও কোনোদিন কোনো ছেলের সঙ্গে দুঘন্টা ধরে আলাপ করতে যাইনি বা দুর্গা পূজাতেও কারও জন্য বাসষ্ট্যাণ্ডে অপেক্ষা করিনি। রঞ্জুর সঙ্গে মানকুণ্ডুতে কোনোদিন সিনেমা দেখতে যাইনি। ঐ দিন যিশু মানকুণ্ডুতে ছিল আর আমরা ট্রেনে করে যচ্ছিলাম তাই দেখা হয়েছিল। ঐ দিনই চলচ্চিত্রমে 'রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় বই দেখলাম। এরা আমার কি দেখে ঐরূপ মন্তব্য করে যে, আমি বারো বেটা নিয়ে ঘুরি? এসব কি তাদেরই মন্তব্য না তুমি সেদিন কলেজে আমাকে দেখে ঐরূপ মন্তব্য করলে? ঐসব কথা তুমি কি করে লিখলে? সত্যি আমার আর কিছু ভালো লাগছে না। তোমার প্রতি কথার শাণিত বাণ তীব্রভাবে আমার বক্ষ ভেদ করছে। কি জ্বালা!

আমি সইতে পারছি না। তোমার হলাহল মিশ্রিত বানগুলো ফিরিয়ে নাও। সব না হয় অন্তত কিছু। আমাকে একটু মুক্তি দাও। সত্যি বিশ্বাস করো। তুমি যতটা ভাবছ আমি ততটা নই। সেদিন কেন জানি না ভগবান আমায় এতটা মুখরা করেছিল। হয়তো বা তোমার সামনে আমাকে বিপন্ন করবার জন্যই। তুমি তো জানো, আমাকে সেই ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছ, আমি চুপচাপ থাকতে ভীষণ ভালোবাসি, কিন্তু কলেজে গেলে তা পারি না। সকলে এমন করে যে, কথা না বলে কিছুতেই থাকতে পারি না --- কেউ পারে না। ঐতো মায়াও তো ঐ রকম চুপচাপ থাকত, সেওতো বেশ হাসাহাসি ইয়ার্কি করে। সেদিন তুমি ছিলে তাই এত ভালো ছিল। যাক আমি নিজে খারাপ। অপরের ভালোমন্দ বিচার করতে পারি না। তাই যদি ভুল করে থাকি ক্ষমা কবো।

তবে বাইরে যদি কোনো ছেলের সঙ্গে ঘুরি, তবে যেন অপর কোনো ছেলের সঙ্গে ঘুরিনি, নিজের আত্মীয়ের সাথে ছাড়া। তাতে বাবো বেটা নিয়ে ঘুরি এমন কথা কেউ বলতে পারে না। আমার নামে যে ঐ রকম বিশ্রী কথা বলেছে তার কি হবে দেখবে। ভগবানকে যদি বিশ্বাস করি তবে শীঘ্রই তার পতন অনিবার্য।

এক প্রকৃতির লোক আছে যারা লোকের কুৎসা রটাতে, নিন্দা করতে ভালোবাসে। যাক লোকে যা বলে বলুক, তুমি তাদের কথা বিশ্বাস না করে, নিজে অনুসন্ধান করো। তুমি লিখেছ, আমি দাদার দলে ভিড়েছি। দাদার বোন যেহেতু, সেইহেতু দাদার অনুগামী হব, তাতে আব আশ্চর্য হবার কি আছে? তবে ওর মতো চরিত্রহীন হব না। ওর কথা আমায় বলবে না। আমি সব জানি। মীরাদি, বিমানদি, ঋতুদির সঙ্গে ওর ব্যবহার আমার অজানা নয়। মরুকগে আমার কি? আমি তো আর ওব সঙ্গে চিরকাল থাকব না। ওর ভাগ্য ও নিজেই রচনা করছে। পরে কষ্ট পাবে।

ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম, তাই অনেক কিছুই লিখে ফেললাম। কিছুতে যদি দুঃখ পাও তো ক্ষমা করে নিও। দুঃখ করো না। অনেক রাত হয়ে গেল। আর নয়। এবাব চলি। কেমন? তোমার প্রতি রইল আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ও আন্তরিক ভালোবাসা।

ইতি ---
''শ্রদ্ধা''

Kali

দুদিন যাবৎ চিঠিটা নিয়ে ঘুরেছি, দেবার আর সুযোগ হয়ে উঠেছে না। বৌদির কাছেও দিয়ে আসার সময় পাচ্ছি না। কাল আশা করি চিঠিটা তোমার হাতে গিয়ে পৌছাবে। চিঠিটা কাছে রয়েছে বলে আর একটু বেড়ে গেল। হ্যাঁ, শোনো নীলুদার সম্বন্ধে সেই কথাটা কে বলেছে ঠিক করে আমাকে বলবে --- আমি ঠিক জিজ্ঞাসা করব আর তুমি যদি বলো, তবে আমি ঠিক নীলুদাকে জিজ্ঞাসা করব এমন কথা কে বলেছে? আমি ঠিক জিজ্ঞাসা করব কিন্তু। এসব কথা কার সহ্য হয়? আমার এখনই জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছে। করছি না শুধু তোমার অপেক্ষায়।

সেদিন তোমার আমাকে ট্রেন থেকে ফেলে দেবার ইচ্ছা হচ্ছিল তাই না? কেন দিলে না?

তবে আমিও বাঁচতাম, তুমিও বাঁচতে? তোমার মঙ্গলও হোত। ও আর একটা কথা ফ্যাংশনের দিন দাদা বাড়িতেই ছিল না। আর আমি boy fiiend-দের ভরসায় যাইনি। কান্তিদার যাবার কথা ছিল যায়নি -- আর মায়ার মুখে শুনেছিলাম তুমি যাবে। আর দাদা সেদিন যাদবপুরে ছিল।

· তুমি মায়াকে একটু সাবধান করে দিও। আমার সঙ্গে যেন একটু কম মেশে। তা না হলে বলা যায় না তো, খারাপের সঙ্গে মিশেলে খারাপ হবার সম্ভাবনাই বেশি। অবশ্য তার Personality তো আছে। তবুও 'সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ' বলে তো একটা প্রবাদ বাক্যও আছে। আমার সাথে থাকলে তো আমি ওকে আমার দলেই টানবার চেষ্টা করব। আর তাছাড়া রঞ্জুর সংস্পর্শে এসে আমার সব গেছে, আর আমার সংস্পর্শে এসে ওর সর্বনাশ হবে। তাই আগেই বলেছি যে, ওকে একটু সতর্ক করে দিও কেমন? আমিও সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকব।

আর তোমার জন্য বড় দুঃখ হচ্ছে -- কারণ তুমি এ রকম একটা মেয়েকে ভালোবাসলে যার কাছ থেকে পেলে সারা জীবন প্রবঞ্চনা। প্রেমের মূল্য যে দিতে পারল না। ভালোবেসে যে ভুল তুমি করেছ, তার মাশুল তোমাকে বোধ হয় সারাজীবন টানতে হবে । আর আমায়? আমি কি পাব জানো? প্রেম মানুষকে দেয় ঐশ্বর্য, মৃত্যুকে দেয় মহিমা, কিন্তু প্রবঞ্চকতাকে দেয় কি? তাকে দেয় দাহ। আমি সারা জীবন এর শাস্তি ভোগ করব। জ্বলে পুড়ে মরব। আমি পাব সেই দাহ।

তোমার বোধ হয় খুব রাগ হচ্ছে চিঠি পড়ে তাই না? কিন্তু কি করবে বলো? অভিনেত্রীরা তো একটু বেশি ন্যাকামো করে তাই না? তা না হলে তারা লোককে মুগ্ধ করবে কি করে? প্রত্যেক অভিনেত্রী সুন্দর দেখতে হয় না— কিন্তু তাদের অভিনয়টা তো নিঁখুত হওয়া চাই — নাহলে তারা জনপ্রিয়তা লাভ করবে কি করে? ভীষণ রেগে যাচ্ছ তুমি। আমার কাছ থেকে এরকম একটা চিঠি আশা করতে পারনি তাই না? আর চিঠি তো দূরের কথা আমার কাছ থেকে কি ঐ রকম ব্যবহাব আশা করেছিলে? সকলেই যা আশা করে তা কখনোই পায় না। তাই তোমার আশাও এক্ষেত্রে পূর্ণ হয়নি -- সেজন্য একমাত্র দায়ী আমি। আমি ভালো করেই জানি যে, এর শাস্তি আমি পাব। এ অপরাধের শাস্তির তুলনা হবে না। তবে তুমি আমায় ক্ষমা করো। তুমি যদি আমায় সর্বান্তকরণে ক্ষমা করো, তবে শাস্তির ভার কিছুটা লাঘব হবে। লক্ষ্মীটি আমায় তুমি ক্ষমা করো। তুমি সুখী হবে। আমি ভগবানের কাছে এই কামনা করি যে, ভগবান! যে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবেসে গেল, যে শুধু দিল, পেল না কিছুই তাকে তুমি দাও শান্তি, তাকে সুখী করো। আর যে তার একনিষ্ঠ ভালোবাসাকে উপেক্ষা করে চলে গেছে তাকে দাও কঠোর শাস্তি। এবার চলি কেমন? আর আমার বলার কিছু নেই।

"রিক্ত আমি, নিঃস্ব আমি
কিছুই মোর নাই
আছে শুধু হস্তলিপি
দিলাম শুধু তাই।।"
"মানুষ হয়ে জন্মেছ যখন
মানুষ হবার চেষ্টা করো।
তোমার পরে আশা যাদের
তাদের পথে প্রদীপ ধরো।"
"অতীতকে তুচ্ছ করে বর্তমানকে ধরো,
ভবিষ্যৎকে সামনে রেখে জীবন গড়ে তোলো।"
"জীবন খাতার অনেক পাতাই
এমনিতরো শূন্য থাকে,
আপন মনের শূন্য বেদীতে
পূরণ করে লও না তাকে।"

চিঠিখানা পড়ে আমার প্রেম আরও গাঢ় হল। আমিও কবি হয়ে উঠলাম।
চিঠির উত্তরও দিলাম। পরিশেষে লিখলাম যদি তোমার কিছু বলার থাকে তবে আগামীকাল ১০৩০-এ স্টেশানে অপেক্ষা করবে।
যথারীতি দশটা পঁচিশ মিনিটে স্টেশানে এসে দেখি শ্রদ্ধা দাঁড়িয়ে আছে।
আমি একটিও কথা না বলে গাড়িতে চাপলাম। পেছু পেছু ও উঠল।
আমি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলাম -- দক্ষিণেশ্বরে যাবে? ও সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল।
ঠিক করলাম শ্রীরামপুরে নেমে ৩ নম্বর বাসে যাব।
স্টেশনে নেমে দেখি মানসীতে -- উত্তম-সুপ্রিয়ার '**কাল-তুমি-আলেয়া**' বইটি হচ্ছে।
শ্রদ্ধা জিজ্ঞাসা করল--ঐ বইটা দেখেছ?
--হ্যাঁ।
-- কেমন হয়েছে?

— আমার তো ভালোই লেগেছে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অতবড় মোটা বইটার চিত্রনাট্য করা তো সোজা কথা নয়।

ও আর কোনো কথা বলল না। আমি বুঝলাম বইটা ওর আমার সঙ্গে দেখার ইচ্ছা। কিন্তু আমার দেখা হয়ে গেছে দেখে ও আর কিছু বলল না। আমি ওর মনোভাব বুঝে বললাম — আজ কাচা জামা কাপড় পরে আসিনি। অন্যদিন দক্ষিণেশ্বরে যাব। আজ বরং ঐ ছবিটা দেখি।

— তোমার তো দেখা।

— তুমি দ্যাখোনি তো?

— অহেতুক পয়সা নষ্ট হবে।

— হলই বা— তাতে কি?

অতঃপর ব্যালকনির দুটো কর্ণারের দিকে টিকিট কেটে সিনেমা দেখলাম। রেষ্টুরেন্টে খেলাম। তারপর শ্রীরামপুর কলেজের কাছে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসলাম। প্রাণ খুলে দুজনে গল্প করলাম। ওর ডায়রি দেখলাম। তাতে শুধু কবিতা। ও নিজে লেখে। আমার আর ওর মধ্যে সে সময় অনেক কথাই হয়ে গেল।

ও বলল —ও, ওর সময়মতো আমার কাছে আসবে। আমার জীবন সাথীর ভূমিকা পালন করবে। তবে আমি যেন কোনোদিন যেচে ওদের বাড়িতে না যাই। বেশ একটু রাত করেই দুজনে ট্রেনে করে বাড়ি ফিরলাম।

দীর্ঘদিন বাদে বুক থেকে যেন এক পাষাণ ভার নেমে গেল। রাতে ভালো করে ঘুমালাম প্রায় তিন বছর বাদে।

এরপর চলল অবাধে মেলামেশা, সিনেমা দেখা। আমরা আর অপরিচিত রইলাম না। কিন্তু দু একজনকে এই প্রেমের কথা না বলেও পারলাম না। এর ভিতর একজন হল ওর বড় ভগ্নিপতি। এই পাড়ারই ছেলে। আর এ পাড়ায় প্রথম এল. এম. কারি। সে তখন চাকরি খুইয়ে একটা কাজের জন্য আমার সঙ্গে ভাব জমিয়েছিল। আর একজন ওর বাড়ির পাশের যতীন।

মাসখানেক বেশ আনন্দেই কেটে গেল। হঠাৎ একদিন ছন্দপতন হল। ওর জন্য সিনেমার টিকিট কেটে বসে আছি -- ও এল না। অথচ এর আগের দিন কথা হয়েছিল আমি টিকিট কেটে অপেক্ষা করব। ও না আসায় ভাবলাম হয় ট্রেনের গোলমাল নয় শরীর খারাপ হয়েছে। ওর শরীর খারাপ অর্থাৎ মাসিক হয়েছিল ষোল পেরিয়ে, যা বারো তেরো বছরেই হয়। আর ওর ও সময়ের স্থিতিকাল আট/দশদিন। যা সাধারণত তিন/চারদিন থাকে। ওর পায়ে তখন ভীষণ যন্ত্রণা করত, সব সময় গা গরম থাকত, পেটে যন্ত্রণা হত। আর ও উঠতে পারত না। এ সবই আমার জানা।

ভাবলাম হয়তো শরীর খারাপ হয়েছে। ডেট অনুযায়ী ঐ দিন তা হবার কথা।

কিন্তু ওর বাড়ির কাছে এসে দেখি ও যথারীতি ওর বান্ধবীদের সঙ্গে বেরিয়ে ঘরে ফিরছে।

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। ওদের বাড়ির কাছে এসে ওর পরের বোন স্বপ্নাকে ডাকলাম। বেরিয়ে এল সে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম — স্বপ্না, তোর মেজদি ঘরে আছে?

— আছে। তা মেজদির সঙ্গে কি দরকার?

— তা তোকে বলা যাবে না, তাকে ডেকে দে।

ততক্ষণে ও বেরিয়ে এসেছে।

আমি গেট ছেড়ে একটু এগিয়ে গেলাম। ওকে জিজ্ঞাসা করলাম — আজ গেলে না কেন?

— কি হবে গিয়ে? যা হবার নয়, তাকে লালন পালন করে কষ্ট দেওয়া বা পাওয়ার মানে খুঁজে পাই না।

— ও, তুমি আমার সঙ্গে যেতে চাও না। আমার সঙ্গে মেলামেশা বাড়িয়ে অপরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভাঙতে চাওনা। তা আমাকে বললে কি হত? তোমার কি মনে হয়, আমি তোমার মুখে এ্যাসিড্ বালব্ ছুড়বো — না দেবদাসের মতো ছিপের বাড়ী মারব? যাও ঘরে যাও। আর যেন জীবনে আমার চোখের সামনে না দেখি।

নড়বার লক্ষণ দেখা গেল না। টপ্ টপ্ করে চোখের জল পড়তে লাগল। কান্না ভেজা গলায় শ্রদ্ধা বলল -- আমি আমাকে ঠিক চিনতে পারি না।

— কেউ যদি কাউকে চিনতে পারত অর্থাৎ নিজেকে জানতে পারত তবে তো সে বিবেকানন্দ, চৈতন্যদেব হয়ে যেত। তা তুমি তো আর পর্দানসীন নও। বেশ তো স্বাধীন মতো ঘুরতে পার, অগ্রাহ্য করতে পার। তা সেদিন অমন কেঁদেছিলেই বা কেন — আর গালাগাল খেয়েও যার সঙ্গে বেড়ালে, সিনেমা দেখলে, খেলে তাকে অগ্রাহ্য করলে কেন?

— আমি পারি না। কেউ ডাকলে বা কোনো জায়গায় যেতে বললে আমি তাকে এড়াতে পারি না।

-- তা হলে যে কেউ তোমার হাত ধরে টানলেই তুমি তার সঙ্গে যাবে। বেশ, এবার আর সিনক্রিয়েট না করে ঘরে যাও -- আর দাদা ও মায়ের বাধ্য মেয়ে হয়ে সুখী হও। তবে দপ করে আমার চোখের সামনে উদয় হবার চেষ্টা কোরো না।

এরূপ তীক্ষ্ণস্বরে কথা বলার পরেও শ্রদ্ধা নড়ল না। আমি বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম-- ও আমার হাত চেপে ধরে বলল আমায় নিয়ে চল।

— কোথায়?

— যেখানে তুমি থাক।

— আমার এখন থাকার কোনো জায়গা নেই। তবে এখনও যদি তুমি আশ্বাস দাও আমি তা করতে পারি।

— কিন্তু আমি তো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি। বাড়িতে স্বপ্না, মিত্রা, নিপু সকলের সামনে তুমি আমায় ডেকে এনেছ। আমাদের কথা সকলে শুনেছে। বোধ করি মাকেও ওরা বলে দেবে। এমতাবস্থায় কি করে ঐ বাড়িতে যাই?

— দ্যাখো, ন্যাকামো না করে ঘরে যাও। আমায় আস্তানা তৈরি করার সুযোগ দাও।

এর ভিতর পাড়ার এক বিশিষ্ট নাগরিককে আসতে দেখে ও আমার হাত ছেড়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

সাত

পরদিন দশটা।

সারা পাড়া ও স্টেশন ঘুরে শ্রদ্ধাকে না পেয়ে বাড়ি ফেরার পথে দেখি, সে পাড়ার এক বৌদির কাছে বসে আছে।

তাকে দেখে চমকে উঠলাম। তার চোখের কোণে কালি পড়ে গেছে। চোখ দুটি কান্নায় ভেজা ফোলা, চুল এলোমেলো, পরনে গত সন্ধ্যার সেই শাড়ি।

আমাকে দেখেই ও এগিয়ে এল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম -- তুমি আজ কলেজ যাওনি?

— দেখতেই তো পাচ্ছ।

-- শরীর খারাপ?

— না।

-- তবে কলেজ কামাই করে এখানে বসে গল্প করছ?

জবাব পেলাম না। অবনত মস্তকে পায়ের নখ দিয়ে মাঠি খুঁটছিল সে, আর কাপড়ের আঁচলের মাঝে চোখের জলকে শুষে নেবার চেষ্টায় ছিল।

— কিছু বলবে?

— তুমি তোমার বৌদির বাসায় যাও -- আমি একটু পরেই ওখানে আসছি।

কিছু পরে ও সেখানে এল।

ঘরে ও আর আমি। দরজা বন্ধ। আমার উরুর পরে মাথা রেখে -- মানে গালের একটি পাশ চেপে ধরে মনের সুখে কেঁদে নিল। আমি বাধা দিলাম না। সান্ত্বনার স্পর্শও ললাটে পৌঁছাল না।

কান্নার বেগ প্রশমিত হলে আবেগ মথিত স্বরে আমি বললাম — তুমি এখন কি করতে চাও?

-- তুমিই বলো, আমি এখন কি করব? দাদা ও মায়ের মতে চলব? না মনের মানুষের সঙ্গে ঘর ছাড়ব?

— আমার তো মনে হয় তোমার তাদের মতানুসারেই চলা উচিত।

— আর তুমি? তোমার কি হবে?

-- কি আবার হবে — যেমন আছি তেমন থাকব। কেন তুমিই তো লিখেছ — জীবন খাতার অনেক পাতাই এমন তারা শূন্য থাকে। তাই থাকবে।

— তা চলবে না। আমি যদি অন্যত্র বিয়ে করি তোমাকেও করতে হবে।

— দ্যাখো, ওসব ন্যাকামো কথা বাদ দাও। মেয়েরা কখনো বিয়ে না করে থাকতে পারে

না। তুমি বিয়ে করো, যোগ্য ঘর ও বর পাও এই কামনাই করি। তোমার চোখে জল দেখতে চাই না। তবে একটা কথা স্থির জেনো, যদি বাড়ির অভিভাবকের মতো বিয়ে করো, আর আমায় সে বিয়ের অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করো আমি যাব। কিন্তু যদি অন্য কারও সঙ্গে প্রেম করো — তবে তার প্রতিদান পাবে। নিজের জীবন দিয়ে আমি তার মূল্য দেব।

একথার কোনো উত্তর না দিয়ে সে আমার কাছ থেকে আবার একটা ছোট্ট ডায়রি টেনে নিল। তাতে কলম দিয়ে লিখল — কাল সারারাত ও আজ অনেক ভেবে ঠিক করেছি যে, আমি তোমাকেই বিয়ে করব; যদি আমাদের উভয় বাড়িতে এই বিয়েতে মত না দেয় আমরা তখন Registration marriage. করব।

ভাবে গদগদ্ হয়ে আমরা উভয়ে উভয়ের ঠোঁটের স্বাদ নিলাম। এক থালায় বৌদির রান্না কৈ মাছের ঝাল দিয়ে ভাত খেলাম। তারপর ও ওর বাড়ি গেল আর আমি বন্ধুর সঙ্গে সিনেমা দেখতে গেলাম।

পরদিন Marriage Registration অফিস থেকে ফর্ম আনলাম। দুজনে তাতে সই করে দিয়ে এলাম। একমাস বাদে ঘর বাঁধব ঠিক করে ঘর ভাড়া নিলাম। বিছানা ও আসবাবপত্রও তৈরি হল।

কয়েকদিন আর দেখা হল না শ্রদ্ধার সঙ্গে। পথে যতীনের সঙ্গে দেখা হলে সে হঠাৎ প্রশ্ন করে কি খবর?

— ভালো। তোমার খবর কি?

— আমি তো শ্রদ্ধাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিতে যাচ্ছি।

— তুমি দিতে যাচ্ছ, আর আমাদের তো সই সবুদ হয়ে গেছে।

— বটে, আমি এ হতে দেব না। দুটো জীবন এভাবে নষ্ট হতে দেব না। ওর লেখা চিঠি শো করাব।

— দ্যাখ, ও আমার স্ত্রী। ওর বিরুদ্ধে কোনো বাজে মন্তব্য শুনতে আমি রাজি নই। তুমি যদি ওর লেখা একখানা চিঠিও আমাকে দেখাতে পার তবে তোমার বিয়ের সাক্ষী হব। আর চিরতরে এ গ্রাম ছাড়ব। আর যদি তা না দেখাতে পার, তবে চব্বিশ ঘন্টার ভিতর তোমাকে পাড়া ছাড়া করাব।

আমি তখন পাড়ার যাত্রা, থিয়েটার, ক্লাবের সেক্রটারি, ফুটবলে অংশগ্রহণকারী। বয়স্করা আমায় ভালোবাসে, ছোটরা শ্রদ্ধা করে, সমবয়সীরা আমার পরে আস্থা রাখে। আমার ধারণা সকলে আমায় অন্য নজরে দেখে। আমি অজাত শত্রু।

এর পরেই ঘটল বিপর্যয়।

❄

ঐ দিন আমি এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার দরজায় পৌঁছালাম।

মনে আছে ২২শে জানুয়ারি দেবানন্দ ও বৈজন্তীমালা অভিনীত 'অমরদীপ' ছবিটি দেখে ফিরেছি বন্ধুর সঙ্গে সান্ধ্য প্রদর্শনীতে।

রাত ন টা।

বাড়িতে এসে দেখি স্নেহময়ী দেবী অর্থাৎ শ্রদ্ধার মা বসে আছেন। ভাবলাম হয়তো কিছু টাকার দরকার। এমন বহুবার তিনি এসেছেন তার মেয়ের জন্য টাকা নিতে। আজও ছেলের চাকরির পরেও যখন কাজ ছাড়েননি তখন নিশ্চয় টাকার জন্য এসেছেন।

মা গম্ভীর স্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন -- শ্রদ্ধার মা কি বলছেন?

আমি না জানার ভান করে বললাম -- কি বলছেন?

শ্রদ্ধার মা-ই মুখ খুললেন -- তুই আর শ্রদ্ধা নাকি আজকাল প্রায়ই সিনেমা দেখিস?

- রোজ দেখি না। তবে মাঝে মধ্যে সিনেমা দেখলে ওর সঙ্গে দেখি।

-- দিদি, শুনলেন তো সব। আপনার অভিমত কি?

- আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি, আপনাদের সঙ্গে আমাদের কাজ হয় না। দেশের বাড়িতে বঙ্গজ কায়েতরা আমাদের বাড়িতে খেয়ে এঁটো পেড়ে যেত। তবে আমার ছেলে যদি আপনার মেয়েকে বিয়ে করে আমি বাধা দেব না। তবে এরূপ বিয়েতে মত দিয়ে বাড়িতেও অশান্তি হতে দেব না। আর দেখুন, দেশের বাড়িতে যা হয় হোক, এখানে আপনার মেয়েকে আমি অবজ্ঞা করি না। তবে, --- আমার ছেলে রোগা আর আদুরে। একখানা রুমাল পর্যন্ত সে কেচে ব্যবহার করে না। তাই আমি চাই, আমার ছেলের দায়িত্ব এমন একজনের পরে বর্তাক, যে আমার অবর্তমানে আমার ছেলেকে দেখবে। কিন্তু আপনার ঐ কালো রুগ্না মেয়ে এ বাড়িতে এলে তো তার সেবার জন্য লোক রাখতে হবে। আমি ছেলের জামা কাপড় কাচি বলে, বৌয়েরও জামা কাপড় কাচতে পারব না।

রাগে গজ গজ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন স্নেহময়ী দেবী এই কথা বলতে বলতে— আগে ঐ মাইয়াকে বিষ খাওয়ামু -- তারপর নিজে খামু।

আমি শান্ত স্বরে বললাম -- দেখুন ওর কোনো দোষ নেই। সব দোষ আমার । যা বলার আপনি আমায় বলুন। ওকে কিছু বলবেন না। আর আপনাদের অমত থাকলে না হয় এ বিয়ে হবে না।

আমার কথা তার কানে গেল না। তিনি কোনো উত্তর না দিয়েই বেরিয়ে গেলেন।

আমি পেছু পেছু গিয়ে ওদের বাড়ির দরজায় গিয়ে শুনলাম -- শ্রদ্ধার মা বলছেন -- কালী তোর জন্য আজ আমাকে আপমানিত হইতে হইল। এইভাবে মুখ পোড়াবি বইলাই কি এতদিন তোরে খাওয়াইয়াছিলাম? তোর জন্যই আজ আমি মুখ বুইজ্যা অপমান সহ্য কইর‍্যা আইলাম। মুখপুড়ি এইভাবে মুখ পোড়াইবি বইল্যাইকি তোরে কলেজে ভর্তি করছিলাম।

ঝাঝালো স্বরে প্রশ্ন করে শ্রদ্ধা --- আমি কি করছি? আর কে তোমাকে অপমান করল?

-- তুই সুব্রতর সঙ্গে সিনেমায় যাস নাই?

-- দুই একদিন গ্যাছি। তাতে হয়েছে কি?

-- কি হইবে? সে তো তোরে বিয়া করতে চায়।

— চাইলেই হল? দ্যাখো, আমার জন্য তোমার মুখ পুড়বে না। পোড়ে তো দাদার জন্য পুড়বে।

এরপর ওর দাদাকে আসতে দেখে স্থান ত্যাগ করলাম।

* *

২৩শে জানুয়ারি। এল সেই অবিস্মরণীয় রাত। যার স্মৃতি আজ বিশ বছর বহন করে চলেছি।

একটি বিশেষ কাজে কোলকাতায় গিয়েছিলাম। গিয়েছিলাম মূলত টাকার জন্য। কারণ আমার মনে হয়েছিল বাড়িতে আমার স্থান হবে না। আর শ্রদ্ধাও যদি অর্থলোভী আত্মসুখসর্বস্ব না হয় -- তবে আমার সঙ্গে ঘর ছাড়বে। তাহলে টাকার দরকার হবে।

বাড়িতে ঢুকতেই মা বললেন -- হাব্‌লু দুবার তোর খোঁজে এসেছিল। আবারও আসবে।

হাবলু মানে শ্রদ্ধার দাদা আমার একসময়ের অকৃত্রিম বন্ধু। আমার সাথে এক বিছানায় শুয়ে যার অনেক রাত কেটেছে। পাড়ায় যাদের কেউ ঘর দিচ্ছিল না। কারণ ওরা এসেছিল ওদের অসুস্থ মাসিকে দেখতে। মাসি মারা গেল, মারা গেল উপার্জনশীল বাবা। তখন তারা ঐ বাড়িতেই বসবাস শরু করে। পরে মাসির ছেলেকে ঐ বাড়ির বড় মেয়ে চোর বলায় সে ওদের ঘর ছাড়তে বলে। তখন আট টাকা মাসিক ভাড়া দিতে হবে বলে আমাদের পাশের বাড়িতে ওদের নিয়ে আসি আমি। বড় মেয়ে পাড়ায় এসেই প্রেম বিবাহ করায় অনেকে বলেছিল এবার এ বাড়ির সর্বনাশ হবে। আমি ফেঁসে গেলাম।

হাব্‌লুকে সেই যে চিঠি লিখেছিলাম এবং তার জবাবে সে লিখেছিল তার পরে আমি তাকে যা লিখেছিলাম তারপরে তার সঙ্গে আমার কথা বন্ধ। সে আজ এ বাড়িতে আমার

খোঁজে এল কেন?

আমার ভাবনার স্রোত বেশি দূরে গড়িয়ে যাবার আগেই দেখি হাবলু তার বড় ভগ্নিপতি অধীরের সঙ্গে ঢুকছে।

বিনা ভূমিকায় বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে হাবলু বলল — সুব্রত, আমি ভেবেছিলাম সেদিনের সেই চিঠির পর আমাদের সম্পর্কে চিড় ধরেছে। কিন্তু তুমি আমার জামাইবাবু ও মায়ের কাছে বলেছ তা হয়নি। তোমরা নাকি রেজিষ্ট্রি বিয়ে করতে যাচ্ছ। তার দরকার নেই। তোমার কাছে যা প্রমাণ পত্র আছে তা নিয়ে চল। ও যদি তোমাকে স্বীকার করে, আর তোমাকে বিয়ে করতে চায় তবে তাকে নিয়ে আসবে।

ভাবে গদগদ হয়ে বোকার মতো আমি বললাম -- এই দ্যাখো ওর লেখা চিঠি।

-- আমি এসব চিনি না। তুমি ওকে দেখাবে চল। ও যদি স্বীকার করে আমি এই মুহূর্তে ওকে তোমার সঙ্গে বের করে দেব। তোমার জিনিস আমি বয়ে বেড়াব কেন?

আমি অগ্রপশ্চাৎ কিছুই বিচার না করে ওদের সঙ্গে পা বাড়াতে গেলে মা শুধু ওদের বললেন--- অধীর, হাবলু ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যেও।

হাবলু দৃঢ়তার সঙ্গে বলল -- আপনার ভয় নেই মাসিমা। আমি থাকতে ওর কোনো ক্ষতি হবে না।

আমি আরও ভরসা পেয়ে গেলাম। পরম নিশ্চিন্তে চললাম জীবনের পরম নির্ভরস্থল শ্রদ্ধার কাছে। মনে দৃঢ় বিশ্বাস ওখানে আমার শ্রদ্ধা আছে। যে বারবার আমাকে তার আত্মার আত্মীয় বলে উল্লেখ করেছে।

ঘরে ঢুকে দেখি খাটে মশারি খাটানো। তার ভিতর কারা আছে জানি না। শ্রদ্ধার মা বসে আছেন। তার পাশে শ্রদ্ধা। অদূরে ওর ঠিক পরের বোন স্বপ্না। ছোট্ট টেবিলের পরে একটি হেরিকেন জ্বলছে।

শ্রদ্ধা আমায় দেখে বেশ রাগত স্বরে জিজ্ঞাসা করল --- এখানে কেন এসেছ?

এ সুর আমার সম্পূর্ণ অচেনা। তবুও উত্তর দিতে হল। বললাম -- তোমার দাদা ও জামাইবাবু আমায় ডেকে এনেছে তাই। তা তুমি নাকি আমাকে চেন না। আমার সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই বলেছ?

-- বলেছি। বলেছি এমন কোনো সম্পর্ক নেই বা প্রতিশ্রুতি দেইনি যে, বাড়িতে আমার স্থান হবে না।

-- তুমি আমার সঙ্গে কোনোদিন সিনেমা দেখনি?

এ প্রশ্নের জবাব দিল ওর দাদা হাবলু — দেখতে পারে, তাতে হয়েছে কি?

-- এ চিঠি তুমি লেখনি? এই ফর্মে তুমি সই করনি? এই কথা বলে টেবিলের পরে ছড়িয়ে দিয়ে হাবলুকে বললাম -- দেখবে, যে বোনের পক্ষ সমর্থনে এত সব আয়োজন,

সেই বোন তোমার সম্পর্কে কি লিখেছে?

তারপর শ্রদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করলাম -- শ্রদ্ধা, এসব চিঠি তুমি লেখনি? তুমি আমাকে বিয়ে করবে বলে প্রতিশ্রুতি দাওনি?

মৃদু স্বরে মাথা না তুলে শ্রদ্ধা বলল -- না।

আমি আবারও আমার সবটুকু আবেগ মিশিয়ে কাতর স্বরে বললাম -- শ্রদ্ধা, তুমি মাকে ছুঁয়ে বলতে পার, এ চিঠি তোমার নয়? আমাকে তুমি কোনো প্রতিশ্রুতি দাওনি?

দৃঢ়স্বরে শ্রদ্ধা বলল -- আমি তো মাকে ছুঁয়েই আছি।

ঠিক তখন হাব্‌লু বলল -- দেখি আমার স্নেহের বোন তার আপনার জনের কাছে কি লিখেছে, বলে একটি চিঠি দেখতে যেতেই সব চিঠিগুলি এবং যে কাগজে শ্রদ্ধার সই ছিল সেগুলি নিয়ে শ্রদ্ধা মেয়েদের সেফ্ ডিপোজিট ব্রার নিচে চালান দিল।

আমার সর্বস্ব চলে যাচ্ছে -- চলে যাচ্ছে আমার বেঁচে থাকার, লোকের টিটকারী না খাওয়ার প্রমাণপত্র। তা দেখে খপ করে ওর হাতখানা চেপে ধরে তা কাড়তে গেলাম।

প্রতিবাদ ধ্বনিত হল কূটনৈতিক চালে বিজয়ী হাবলুর -- হুঁ হুঁ -- আমার চোখের সামনে তুমি আমার বোনের হাত ধরতে পার না। আর তা আমি সইব না।

এরপর আমার জ্ঞান বিলুপ্ত হল। আমার পায়ের তলার মাটি সরে গেছে। মাথা ঘুরছে। এ দেহকে আর নিজের দেহ বলে মনে হচ্ছে না।

এ কি করে সম্ভব? একটি মেয়ে -- যাদের মন মমতায় ভরা থাকে, যাদের হৃদয়ে থাকে কোমলতা। তারা এত নিষ্ঠুর কি করে হতে পারে? শ্রদ্ধা কি বুঝল না যে, এখানে আমি তার ভরসায় এসেছি? সে ছাড়া এখানে আমার কেউ নেই?

স্নেহময়ী দেবী এতক্ষণ এই আসরে নীরব শ্রোতা ও দর্শক ছিলেন। এবার সরব হলেন-- আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন -- দ্যাখ, তুই এই বেইমান মাইয়ারে ভুইল্যা যা। যে তোকে স্বীকার করল না তাকে ভাইব্যা আর দুঃখ বাড়াস না। এই কথা বলে অত রাতে তিনি বেরিয়ে পড়লেন তাঁর মেয়ের গৌরব গাথা প্রচার করতে।

আমায় বাড়িতে ধরে নিয়ে এল হাবলু ও অধীর। হাবলু আমার মায়ের কাছ থেকে দুগ্লাস জল চেয়ে খেয়ে বলল -- মাসিমা, আমি জানি সুব্রত মিথ্যা বলেনি। ঐ চিঠিগুলো হয়তো আমার বোনের ছিল। কিন্তু আজ যদি কয়েকখানা চিঠির ভিত্তিতে আমি ওকে বের করে দিতাম, তবে লোকে বলত ---- বাপ মরা বোনকে দায়িত্ব এড়াতে দাদা বের করে দিয়েছে। ও না আসতে চাইলে আমি কি করব?

আমার কাছে তখন সমগ্র পৃথিবী মিথ্যে হয়ে গেছে। এমন কি গর্ভধারিণী মা তিনিও আমার এ বেদনার সাথী নন। এর প্রমাণ আমি তখন পেয়েছিলাম -- যখন ওরা আমায় আপমান করেছিল -- তখন কেঁদে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম -- দেখিয়ে দিতে চেয়েছিলাম

যে, আমিও বিয়ে করতে পারি। এসব ক্ষেত্রে মা বাপেরা তাইই করে থাকেন। কিন্তু অত্যন্ত হিসাবী বংশের মেয়ে আমার মা -- তাই ছেলের অপমান গায়ে না মেখে সংসারের কথা চিন্তা করে আমার এ কথায় হেসেছিলেন। এর ফলে ওদের বাড়ির সকলের সঙ্গে আমাদের বাড়ির সকলের ভাব ছিল। শুধু আমি একা ওদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। আজও আমার সৃষ্ট দুঃখের ভাগ নেবার কেউ নেই। ছোট জাতের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হল না দেখে বরং ঠুনকো বংশ মর্যাদার গর্বে মা আনন্দিত হলেন।

আমি তখন ভাবছি -- আমি এখন মুখ দেখাব কি করে? ঐ টুকু কালো মেয়ে কি ধড়িবাজ? চার ফেলে মাছকে খেলিয়ে ডাঙ্গায় তুলে দেখেছে যে, এ রুই কাতলা নয় চুনোপুঁটি। তাই ছেড়ে দিয়েছে।

বুঝলাম, এইভাবে কৌশলে আমার কাছে যে, প্রমাণ পত্র আছে তা আত্মসাৎ করার জন্য ওরা সকলে মিলে একটা গোল টেবিল বৈঠক বসিয়ে পরিকল্পনামাফিক কাজ করেছে।

আর আমি কি বোকা, ওদের ফাঁদে পা দিলাম। এখন তো ওরা আমার বিরুদ্ধে যা তা রটাবে। আর আমি তার প্রতিবাদ করতে গেলে বা রাগান্বিত হয়ে কিছু করতে গেলে বিপদে পড়ব।

ভাবতে ভাবতে ঘড়ির কাঁটা তিনের ঘর পেরিয়ে গেল। আত্মহত্যা করে সব জ্বালার নিষ্পত্তি করতে সচেষ্ট হলাম। ব্লেড দিয়ে গলার শিরা কাটতে ব্যর্থ হলাম। গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে গিয়ে দম আটকে আসছে দেখে কড়িকাঠ ধরে ফেললাম। কিন্তু বাড়িতে থাকতে অস্বস্তি বোধ হল।

বেরিয়ে পড়লাম বাড়ির বাইরে। দূরন্ত শীত। কিন্তু আমার শরীরে ভীষণ জ্বালা। পরনে পাজামা এবং একটা পাতলা শার্ট। তাই পরেই চলে এলাম। রাত তখন ৩ ৪০ মিনিট। গয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা ঐ সময় স্টেশনে এসে পৌছালো। আমি উঠে পড়লাম। আত্মহত্যার সংকল্প তখনও মন থেকে মুছে ফেলতে পারিনি। ভাবলাম বালি ব্রীজের কাছে গাড়িটি এলে ঝাঁপিয়ে পড়ব। ব্রীজের আঘাতে আমার দেহটা ক্ষতবিক্ষত হবে। কেউ চিনবে না -- জানবে না; এ বেশ হবে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী উত্তরপাড়া ছেড়ে বালি ব্রীজে গাড়িটা আসতেই আমি ঝাঁপ দিতে যেতেই বাঁধা পড়ে গেলাম এক পেশী বহুল বলিষ্ঠ হাতের মাঝে।

শুরু হল আর এক ইতিহাস।

নয়

কথায় আছে যার হয় না নয়তে, তার হয় না নব্বইতে। আমার অবস্থাও ঠিক তাই। আমি যখন শ্রদ্ধাকে হারিয়ে ভেবেছিলাম যে, এই পৃথিবীতে আমার কেউ নেই, ঠিক তখন আমার পক্ষে এসে দাঁড়ালেন এক দেব প্রতিম পুরুষ। যাকে সমাজে সবুজ সেন বলে জানে। আমি সে রাতে তার বলিষ্ঠ হাতের মাঝেই ধরা পড়ে প্রাণে বেঁচে যাই।

সমুজ সেন বিপত্নীক। সংসারে আপন বলতে তার কেউ নেই। আছে শুধু টাকা। সে টাকা তিনি মদ-মাগীতে না লুটিয়ে দিয়ে তার প্রিয়তমা পত্নী পলাশের নামে একটি অপেরা পার্টি গড়ে তোলার সংকল্প নিয়ে যখন ঘুরছিলেন ঠিক তখনই তার সঙ্গে দেখা আমার ।

আমার সঙ্গে আলাপ করে, আমার জীবনের কাহিনী শুনে আমার পরে ভার দিলেন **'পলাশ অপেরা পার্টি'** গড়ে তোলার।

আমি এক মাসের প্রচেষ্টায় যে কাহিনীটি মঞ্চস্থ করার সংকল্প করলাম -- তার নাম **"মাতা শত্রু"**।

এই নাম শুনে সবুজ সেন একটু চমকে গেলেন। যে জননী ও জন্মভূমিকে স্বর্গের চেয়েও বড় বলে মনে করা হয়। যেখানে **'মা এক মন্দির'**, **'মাকে আঁচল'**, **'মা তুমি দেবী'** **'মা আমার মা'**, পালা খ্যাতি লাভ করে সেখানে 'মাতা শত্রু' এই বই কি জনগণ নেবে? এ প্রশ্ন তুলেছিলেন সবুজ যেন।

আমি বললাম -- স্নেহান্ধ মায়েরা কী ভাবে তাদের ছেলেদেব খারাপ পথে পা বাড়াতে সাহায্য করে এবং স্নেহ ও শাসন দুইয়ের আবর্তে মানুষ হওয়া মায়ের সন্তানরা কীভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা পায় না এটাই এই বইতে দেখানো হয়েছে। তখন সবুজবাবুর আর আপত্তি রইল না।

গল্পের কাহিনি নিম্নরূপ ---

প্রথম দৃশ্যে দেখা যাবে একজন শিক্ষক ভূগোলের ক্লাস নিচ্ছেন। শিক্ষক মহাশয় ভারতের সীমা জিজ্ঞাসা করায় অনেক ছাত্রই তা বলার জন্য হাত তুলল -- কিন্তু সঠিক উত্তর পাওয়া গেল শুধু একজনের কাছ থেকে। ছেলেটির নাম অসীম চাটার্জী।

স্কুল ছুটির পর সে একখানা চাকু কুড়িয়ে পেল। সে তা বাড়িতে নিয়ে এল। তার অভাবগ্রস্ত বিধবা মা তখন বটি দিয়ে বেগুন ফালি করতে সচেষ্ট ছিলেন। অসীম তখন বাড়িতে ফিরে মাকে বলে -- মা, আজ স্কুলে এই চাকুখানা পেয়েছি -- এটা মাধবের। ওকে দিয়ে আসি।

মা বলেন -- দেখি, কেমন ছুরি কেমন ধার আছে? বলে তিনি ছুরির ধার পরীক্ষা করলেন বেগুনের পরে। খুব সহজেই বেগুণ ফালি হচ্ছে দেখে তিনি ছেলেকে বললেন আরে, এটা যখন পেয়েছিস তখন থাক। কেন মিছিমিছি এই রোদ্দুরে কষ্ট করে দিতে যাবি। ও যদি

কোনোদিন খোঁজ করে তখন না হয় দিস। ছেলে মায়ের কাছ থেকে প্রথম পাঠ শিখে নিল। কোনো জিনিস যদি পাস, তা যার তা জানলেও দিবি না। নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করবি।

দিতীয় দৃশ্য--

এরপর আর একদিন পাড়ার ছেলেরা বল খেলছিল, অসীম বায়না ধরল বল কিনে দেবার। এমন সময় বাড়ির ভিতর একটা বল এসে পড়ল। মা ছেলের হাতে বলটি তুলে দিয়ে বলল --- যা উপরে তোর ঘরে লুকিয়ে থাক -- আমি ডাকলে তবে নামবি।

যাদের বল বাড়ির ভিতর পড়েছিল তারা বল খুঁজতে বাড়িতে ঢুকলে অসীমের মা বলের কথা অস্বীকার করলেন এবং ছেলেরা বাড়ির ভিতরে খুঁজতে চাইলে তিনি তাদের মেরে তাড়ালেন।

তৃতীয় দৃশ্য--

ছেলে মেলায় যাবার বায়না ধরল। মায়ের কাছে পয়সা চাইল। মা তাকে বললেন -- মেলায় যাবি তা পয়সা লাগবে কেন ? যা দরকার নিবি, খাবি, পয়সা না দিয়ে সুযোগ বুঝে ভিড়ের মধ্যে মিশে যাবি।

মায়ের কথা মতো ছেলে জিলিপির দোকান থেকে জিলিপি, পাঁপড়ের দোকান থেকে পাঁপড় খেল। সার্কাসের তাঁবুতে পেছনের চটের ফাঁক দিয়ে ঢুকল। রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া বিড়ি খেলো।

এই বিড়ি খাওয়া অসীমের ক্লাস টিচারের নজরে পড়ায় তিনি ছাত্রের সংশোধনার্থে ছাত্রের মায়ের কাছে অভিযোগ আনলেন। কিন্তু মায়ের আদালতে এ অভিযোগ ভিত্তিহীন মিথ্যা বলে খারিজ হয়ে গেল।

এই ভাবে ক্লাসের সেরা ছেলে অসীম কয়েক দিনের মধ্যে পাক্কা চোরে পরিণত হল।

যে ছেলেটি একদিন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসার, আইনজীবী বা অন্য কোনো সম্মানীয় প্রফেশনে যুক্ত থেকে সমাজের গৌরব বৃদ্ধি করতে পারত -- ভুল শিক্ষায় সে হল পাক্কা চোর।

তবে এসবের মূলে সেই অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা। গরিব বিধবা মায়ের মনেও অনেক স্বপ্ন ছিল, কিন্তু ছেলের সব চাহিদা মেটাবার অর্থ ছিল না -- তাই তো ছেলের চাহিদা মেটাতে অক্ষম হয়ে তিনি অন্যায়ভাবে তার ছেলেকে বিপথে পরিচালিত করলেন।

চতুর্থ দৃশ্য—

ছোট খাট চুরি করতে করতে একদিন গহনার দোকানে ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে যায় অসীম। তবে তার দলের দুজন ধরা পড়ে তার নাম বলে দেওয়ায় তার আর বাড়ি ফেরা হয় না।

বিখ্যাত পুলিশ গোয়েন্দা শ্যামল ঘোষালের উপর তাকে গ্রেপ্তারের ভার দেওয়া হল।

পঞ্চম দৃশ্য--

এদিকে আত্মরক্ষার তাগিদে অসীম যখন গ্রামেগঞ্জে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তখন জ্বরে আক্রান্ত তার মা জল গড়িয়ে খেতে গিয়ে খাট থেকে পড়ে গিয়ে মারা যায়। হিন্দু সৎকার সমিতি তার বডি নিয়ে যায়।

আত্মরক্ষার তাগিদে ঘুরতে ঘুরতে একদিন অসীম দেখল একটি মেয়ে একটি বট বৃক্ষের শাখায় দড়ির দোলনায় দোল খাচ্ছে। খবর নিয়ে জানল ঐ মেয়েটি গোয়েন্দা শ্যামল ঘোষালের একমাত্র আদরের বোন শীলা।

ষষ্ঠ দৃশ্য--

সঙ্গে সঙ্গে দুষ্টুবুদ্ধি মাথায় খেলে গেল অসীমের। সে ভাবল যদি কোনো রকম ছলা কলায় ভুলিয়ে এই মেয়েটির সঙ্গে প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়া যায়, তবে অন্তত এই গোয়েন্দার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। দুচার দিন সে শীলার পরে নজর রাখল। একদিন আবারও যখন ঐ শীলা সেই বট গাছের দোলনায় দোল খাচ্ছিল তখন দুর থেকে ছুঁরি ছুড়ে সে ঐ দড়ির অর্ধেকটা কেটে দিয়ে নীচে অপেক্ষা করছিল। দু'চারবার দোল খেতে খেতে দড়ি ছিঁড়ে শীলা ছিটকে গিয়ে পড়ল সামনের একটি পুকুরে। দর্শকগণ হায় হায় করতে থাকে। ঠিক তখন সেখানে অসীম হাজির হয়ে বিনা দ্বিধায় জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে শীলাকে পুকুর থেকে তুলে আনে এবং সেবা শুশ্রূষা করে বাড়িতে পৌঁছে দেয়।

বাড়ির লোকেরা বিশেষ করে দাদা বৌদি শীলার জীবন রক্ষাকারীকে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করায় শীলা অসীমের সঙ্গে তাদের পরিচয় করায়।

বোনের জীবন রক্ষাকারীকে পরম সমাদরে আপ্যায়ণ করেন শীলার সি. আই. ডি দাদা শ্যামল ঘোষাল।

এরপর কয়েকদিন এ বাড়িতে যাতায়াতের এবং শীলার সঙ্গে মেলামেশা করার সুবাদে তারা পরস্পর পরস্পরের খুব কাছে আসে এবং একদিন বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়।

অসীম যে কিছু করে এটা দেখানোর জন্য ইতিমধ্যেই সে, সেন জুয়েলার্স নামে একটি জুয়েলারি দোকান খোলে।

দোকানটি আসলে ফর শো। ঐ দোকানে প্রতিসপ্তাহে বিখ্যাত সব জুয়েলার্সদের নিমন্ত্রণ করা হয় এবং তারা যখন ওখানে পেগের পর পেগ খেয়ে চোখ লাল করে ঝিমিয়ে পড়েন, তখন তাদের জুয়েলারি দোকানের দামি দামি জুয়েল চুরি হয়ে যায়। আর এ সবই করে অসীম তার সুনিপুণ দুটি হাতে।

জুয়েলার্সরা একজোটে থানায় অভিযোগ দায়ের করে এবং তাদের সতর্ক দৃষ্টি থাকে চোরের প্রতি।

সপ্তম দৃশ্য--

অসীম রোজ রাতে বেরিয়ে যায় আর ফেরে ভোরে। শীলা জিজ্ঞাসা করলে বলে --- দেখো গহনা তৈরি হয় রাতে। কারিগরদের হাতে তো আর অত সোনা ছেড়ে দেওয়া যায় না। নজর না রাখলে তো ওরা সব চুরি করে ফাঁক করে দেবে। তাই আমাকে নজর রাখতে হয়। আসলে অসীম রাতে চুরি করতে বের হোত।

শীলা আর কিছু বলে না।

অষ্টম দৃশ্য--

একদিন শ্যামল ঘোষাল কালো ওভার কোটে মোড়া চাপদাড়িযুক্ত একটি লোককে গভীর রাতে একটি এ্যাটাচি নিয়ে যেতে দেখে তার পেছু নেয়।

ঐ লোকটি তার কাঁটার বেড়া পার হবার সময় তার ওভার কোটের একটা অংশ ছিড়ে যায়।

ঝানু গোয়েন্দা শ্যামল ঘোষাল ঐ ছেড়া অংশটি পকেটে পুরে সে রাতের মতো বাড়িতে ফেরে।

* * *

নবম দৃশ্য--

পরদিন সকাল।

শ্যামল ঘোষালকে দেখা গেল বোনের বাড়িতে।

কাজের লোক, ব্যস্ত লোক দাদাকে বিনা প্রয়োজনে শুধু মাত্র বোনের খোঁজ নিতে এই সাত সকালে আসতে দেখে শীলা অবাক হয়। তারপর এতদিন না আসার জন্য অভিযোগ এবং পরে আপ্যায়ন করে বসায়।

শ্যামলবাবু আসন গ্রহণ করে ভগ্নিপতির খোঁজ নিতে গিয়ে বোনের কাছে সব খবর পায়। রাতের খবরও পায়। কাজ দেখবার জন্য সারারাত জেগে ভোরে বাড়ি ফেরার কথায় তাঁর কেমন অস্বস্তি লাগে। আর সবদিন রাতে বের হয় না। কবে কবে রাতে বাইরে গিয়েছিল এবং ভোরে ফিরেছিল তার খবর নিয়ে শ্যামলবাবুর তীর নির্দিষ্ট নিশানার প্রায় কাছে এসে গেল। তিনি তার নোট বুক বের করে দেখলেন, যেদিন যেদিন অসীম রাতে বাইরে ছিল সেই সেইদিন জুয়েলারি দোকানে চুরি হয়েছিল। তবে কি? তবে কি মনে হতেই বোনের কাছে একটা সিগারেট খেতে চাইল।

ঐ তো তোমার ভগ্নিপতির কোটের পকেটে রয়েছে। ওখান থেকে নিয়ে নাও।

কোটের পকেট থেকে সিগারেট নিতে গিয়ে কোটের একটি কোনা ছেঁড়া দেখে সন্দেহ হতেই গত রাতের কোটের ছোঁড়া টুকরোটা মেলাতে গিয়ে অঙ্কে মিলল। তীর নিশানায় পৌঁছালো। দ্বিতীয় পকেটে হাত দিয়ে পেল এক সেট চাপদাড়ি।

শ্যালকের সাড়া পেয়েই বিছানা ছেড়ে জামা গায়ে বের হচ্ছিল অসীম।

শ্যামলবাবু বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে রিভলবার উঁচিয়ে গর্জে উঠলেন -- হ্যান্ডস্ আপ। তোমার সব কারিগরি ধরা পড়ে গেছে। তুমি শেষ পর্যন্ত বাঘের ঘরে প্রবেশ করে ভেবেছিলে রেহাই পাবে। তা হয় না। আজই তোমার সব খেলার অবসান। কিন্তু তোমার মতো একটা চোরের সরলা মেয়ের জীবনটাকে এভাবে নষ্ট করতে বিবেকে বাঁধল না? অবশ্য চোরের আবার বিবেক কোথায়?

শীলা প্রথম ভেবেছিল এটা শালা ভগ্নিপতির লুকোচুরি খেলা। কিন্তু দাদার মুখে এসব কথা শুনে সে প্রথমে মর্মাহত হয়, পরে সম্বিত ফিরে পেয়ে ভারতীয় নারীর সহজাত ধর্মানুযায়ী শাখা সিঁদুরের মান বাঁচাতে শত অপরাধে অপরাধী স্বামীকে বাঁচাতে অসীমের বুকের সামনে দাঁড়িয়ে বলে -- আমায় না মেরে ওকে তুমি মারতে পারবে না।

-- ওরে বোন তুই যে আমার কত আদরের তা কি তুই জানিস না? আজ তোর কপাল পুড়তে দেখে আমার ইচ্ছে করছে এই রিভলবার নিজের কপালে ঠেকিয়ে আত্মহত্যা করি। কিন্তু অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করার বিদ্যা যে আমি আয়ত্ব করতে পারিনি। তুইও এমন একজন জঘণ্য প্রতারককে ক্ষমা করিস না। ওকে ওর পাপের শাস্তি পেতে দে।

এদের কথার মাঝে অসীম আবারও পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

হাতের মুঠোয় এসেও আসামী পালিয়ে গেল দেখে বোনের পরে যেমন রাগ হল -- তেমনি সহানুভূতিও জাগল। তাই সেদিনই বোনকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেন জুয়েলারি দোকানে ও বাড়িতে পুলিশের পাহারা বসল।

এদিকে শীলা ছিল অন্তঃসত্তা। তাকেও ভর্তি করা হল একটি প্রসূতি সদনে।

দশম দৃশ্য--

প্রথম সন্তানকে একটি বার চোখের দেখা দেখতে কোন পিতাই না কাতর হয় অসীমও হবে এটা স্থির জেনে প্রসূতি সদনের চারপাশে সাদা পোষাকের পুলিশ মোতায়েন করতে কোনোরূপ কার্পণ্য করলেন না শ্যামল ঘোষাল।

প্রসূতি সদনে ঢুকতে ব্যর্থ হয়ে অসীম বাইরে গা ঢাকা দিয়ে থাকল।

সন্তানের জননীরাও তার সন্তানের প্রকৃত দাবিদার যে পরম বিশ্বাসে তার কাছে তাকে গচ্ছিত রেখেছিল এবার সেও তার সেই গচ্ছিত ধন পরম যত্নে পালন করেছে। সে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি তা প্রমাণ করার জন্য সন্তানের পিতাকে সন্তান দেখাবার আগ্রহ মনে মনে পোষণ করে।

কিন্তু শীলা চায় না যে তার সন্তানের পরে তার স্বামীর অশুভ ছায়া পড়ে। আর তার কলঙ্কময় জীবনের বোঝা সে তার দাদার পরেও চাপতে চায় না। তাই সন্তান ভূমিষ্ট হবার তৃতীয় দিনেই সে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে নার্সিং হোম ত্যাগ করতে সমর্থ হয়। পথে

পুলিশের বাধা পেলে সে বলেছে তার দাদার নির্দেশেই সে বাড়ি যাচ্ছে। শ্যামলবাবুর বোন শ্যামলবাবুর বাড়িতে যাবে এতে কে বাধা দেবে?

ভালোবেসে বিয়ে করার এখানেই মস্ত বিপদ। ভালো হলে তো ভালো -- কিন্তু খারাপ হলে তার দায়িত্ব কেউ নেয় না। তাকে একাই সে দায়িত্ব নিতে হয়।

শীলার দাদা-বৌদি এত তাড়াতাড়ি এখানে তার বোনের বিয়ে দিতে চায়নি। বোনের ইচ্ছেতেই এটা ঘটেছে। আজ ঠকে গিয়ে হার স্বীকার করে তাদের বশ্যতা স্বীকার করার চেয়ে মৃত্যুও অনেক ভালো।

নার্সিং হোমের কম্পাউণ্ড ছেড়ে বেরিয়ে আসতেই অসীমের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

শীলাকে দেখে আগ্রহ ভরে এগিয়ে এসে অসীম বলে -- আমি জানতাম তুমি আসবে।

-- আমিও তোমার নজরের বাইরে যাব বলে নার্সিং হোম ত্যাগ করেছি।

-- আমি কি এতই ঘৃণ্য?

--সে কথা তুমি তোমার নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করো। অবশ্য মন বা বিবেক নামক কোনোও পদার্থ আজও তোমার মধ্যে যদি থেকে থাকে।

-- দ্যাখো, আমি তোমাকে সত্য গোপন করেছি সত্য কিন্তু আমার ভালোবাসা মিথ্যে নয়। আর মিথ্যে নয় বলেই আমার ঔরসজাত সন্তানকে একটিবার চোখের দেখা দেখতে এসেছি।

-- দ্যাখো, এ সন্তান তোমার। এযে তোমার ঔরসজাত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি তোমার স্পর্শ থেকে, সংস্রব থেকে ওকে বাঁচিয়ে রাখতে দূরে সরে যেতে চাই। আমি আমার ছেলেকে চোরে পরিণত হতে দিতে চাই না। আর যদি তুমি জোর করে তোমার অধিকার অর্জন করতে সচেষ্ট হও, তবে আমি আত্মহত্যা করব। যদি তুমি চাও, তুমি সন্তানের পিতা -- অতএব তুমিই এই সন্তানের ভার নেবে, তা নিতে পার। কিন্তু এই সন্তানকে তুমি স্পর্শ করা মাত্র আমি আত্মহত্যা করব।

জীবনে এই প্রথম অসীম তার চলার পথে হোঁচট খেল। সে ভাবতেও পারেনি তার জীবনসাথী এমন রূঢ় হতে পারে। কি হবে আর মায়া বাড়িয়ে? কাদের জন্য তার এত মমতা? কি হবে আর জীবন রেখে? মনের মাঝে গ্লানি ক্লেদ জমে উঠল।

ছেলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে উদ্যত হলে শীলা পিছু ডাকল -- ছেলেকে বাপের সামনে এনে বলল -- দ্যাখো। জীবনে কোনোদিন যদি সৎ ও সুস্থ নাগরিক হয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াও, সেদিন আমি তোমায় ফিরিয়ে দেব না। আর যাই করি, তোমার খোকাকে পিতৃদ্বেষী তৈরি করব না। তার সামনে একজন সৎ, সুস্থ, আদর্শবান পিতার চিত্র তুলে ধরব। আশা করি আমাদের সন্তান যেন একজন আদর্শ পিতাকে পায়।

দুচোখে অশ্রুর বন্যা বয়ে যায় শীলা ও অসীমের । সে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে।

একাদশ দৃশ্য--

এর পর কেটে যায় আরও বারোটি বছর।

স্বামীর প্রতীক্ষার আশায় দিন গোনে শীলা। কারণ সেদিন জোর করে অধিকার অর্জন না করে নীরবে সরে গিয়ে অসীম প্রমাণ করেছে যে, পুত্রের চেয়ে পত্নীর মূল্য তার কাছে বেশি। পত্নীর জীবনের বিনিময়ে সে কোনো কিছু লাভ করতে চায় না।

মনের শান্তি ফেরাতে অসীম তার যথাসর্বস্ব এমনকি গায়ের কোটটা পর্যন্ত একজন ভিখারিকে দিয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ায়। কখনো আহারে, কখনো অনাহারে, কখনো সাধুসঙ্গে, কখনো তীর্থ যাত্রীদের সঙ্গে তার দিন কাটে। কিন্তু শান্তি সে পায় না। শেষে পত্নী ও পুত্রের সঙ্গে দেখা করতে সে আবার ফিরে আসে বাংলায়।

মুখে কাঁচাপাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরনে ছিন্ন মলিন বেশ, জীর্ণ দেহের অসীমকে তার পরিচিতেরা সহজে চিনতে পারবে না। অনেকের কাছে শীলার কথা জিজ্ঞাসা করতে করতে একটি টালির চালের বাড়ির বারান্দায় পক্ক কেশের শীলাকে চাল বাছতে দেখে গাঢ়স্বরে সে ডাকে -- শীলা, কেমন আছো?

একবার মুখ তুলে চেয়েই কিন্তু শীলা তার প্রৌঢ় স্বামীকে চিনতে পারল। বলল -- এতদিনে শীলার কথা মনে পড়ল? এই তোমার ভালোবাসা, স্নেহ? বলতে বলতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল শীলা।

ছুটে গিয়ে তাকে দুহাতে না ধরলে জ্ঞান হারাত সে। স্ত্রীকে বুকের মাঝে চেপে ধরে কান্না মাখানো স্বরে অসীম বলে -- শীলা, আমি এই বারো বছরে গোটা ভারত ঘুরেছি। দেখেছি বহু দেব-দেউল। আর সংস্পর্শে এসেছি বহু সাধুসন্তের -- কিন্তু সকলের মাঝে বার বার তোমার মুখই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে।

--- তাই বুঝি এতদিন পরে এলে? এত অভিমান?

— দ্যাখো, আমি ভেবেছি, তুমি তো কোনোদিন কোনো কাজ করনি, দাদা তোমায় আদরেই রেখেছেন। এখানে এসেও অনাদর পাওনি। আমি জানতাম, তুমি যেমন আমার আয়ের পয়সা নেবে না, তেমনি দাদার ওখানে থেকেও আমার অমর্যাদা করবে না।

-- এত যদি জানতে তাহলে একটিবার এলে না কেন?

-- এলাম না -- সৎ হবার জন্য। আচ্ছা, খোকা কোথায়?

-- সে স্কুলে গেছে। এখনি আসবে।

-- আচ্ছা, আমাদের খোকা কোন ক্লাসে পড়ে?

-- সেভেনে।

-- দেখতে কেমন হয়েছে?

-- তা এলেই দেখো?

-- আমার নাম করে তো?

-- করে গো করে। সন্তান তার পিতা মাতার উপর বিরূপ মনোভাব পোষণ করলে উন্নতি করতে পারে না বলেই আমার বিশ্বাস। তাই আমি তাকে তার পিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবার শিক্ষাই দিয়েছি।

এমন সময় স্কুল থেকে ফিরল শুভম। অসীমের ছেলের নাম শুভম রেখেছে শীলা।

শুভমের হাতে একটি নতুন চাইনিজ পেন দেখে শীলা জিজ্ঞেস করে -- হ্যাঁরে শুভম এই পেনটা কার?

--- আমি ক্লাসরুমের সামনে এটা কুড়িয়ে পেয়েছি।

-- কার তা জানিস না?

--- জানি।

--- জানিস তো তার পেন তাকে দিয়ে আসিসনি কেন? শীলার কণ্ঠে ধমকের সুর।

-- তখন স্কুল ছুটি হয়ে গিয়েছিল। কাল ক্লাসে গিয়েই দিয়ে দেব।

-- দ্যাখ, শুভম, কোনোদিন রাস্তার কোনো জিনিস তুলবে না। আর যদি তোল -- আর জানো যে জিনিসটি কার, তবে তাকে তা দিয়ে আসবে।

-- এবার আমায় খেতে দাও। বড্ড খিদে পেয়েছে।

-- আচ্ছা, এই পেনটা যার, তার বাড়ি কি আমাদের পাড়ায়?

-- হ্যাঁ।

— তবে যা, চট্ করে পেনটা তাকে দিয়ে আয়, আমি তোর খাবার রেডি করছি।

শুভম বেড়িয়ে গেল।

ঘরে ঢুকে শীলা দেখে দু নয়নে বারি ধারা বয়ে যাচ্ছে অসীমের।

-- এ কি, তুমি কাঁদছো কেন? শীলা কাছে এগিয়ে এল।

-- শীলা, আজ আমার মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। আমার মা যদি তোমার মতো হোত, তবে আজ আমি চোর হতাম না। তুমি শেখালে পরের জিনিস কুড়িয়ে পেয়ে তাকে তা দিতে হয়, আর আমার মা শিখিয়েছিলেন পরের জিনিস পেয়ে যদি দেখিস তেমন জিনিস তোর নেই, তবে তা আত্মসাৎ করবি। আমার জীবনে আমার মা মিত্র না হয়ে শত্রু হয়েছিলেন। আমার জীবনে '**মাতাই শত্রু**'।

দশ

আতা শক্রর কাহিনি এখানেই শেষ। তিনশ রজনী অতিক্রান্ত নাটক। হাউস ফুলের পরে হাউস ফুল। ঐ নাটকে শীলার ভূমিকায় অভিনয় করেছিল বিখ্যাত নটী সুদীপ্তা দেবী। আর নট্যকার ও অভিনেতা আমি।

নাটক যখন স্টেজে জমেছে, তখন আমার মনেও রঙিন স্বপ্নের ছোঁয়া লেগেছে। নায়িকা সুদীপ্তা গ্রীণ রূমের বাইরেও আমার সঙ্গ ছাড়ে না।

শ্রদ্ধার বেইমানী তখন অনেকটা বিস্মৃত হয়েছি। মাঝে মাঝে যখন ক্ষত স্থান থেকে রক্ত ঝরে, ক্ষত সৃষ্টি করে, বেদনা অনুভূত হয় --- তখনই সুদীপ্তার সুডৌল দেহের পরশ লেগে সেই ক্ষত বন্ধ হয়ে যায়।

সেই সময় একদিন আবারও একটি চিঠি এল। সময়টা ৬৮ সালের পুজোর পর।

চিঠিটা নিম্নরূপ--

Kali

অবিস্মরণীয়াসু --

জানি আমার মতো বেইমান বিশ্বাসঘাতিনীর কাছ থেকে তুমি কোনোরূপ পত্র পাবার আশা করো না। কিন্তু তবুও তোমায় আমি জানাই আমার বিজয়ার সশ্রদ্ধ প্রণাম। তোমার নাটক নাম করেছে। মঞ্চস্থ হয়েছে। তুমি নিজেই নায়কের দায়িত্ব পালন করেছ। যে দেখেছে, সেইই প্রশংসা করেছে। তাদের কাছে প্রশংসা শুনে শুনে আমি আর স্থির থাকতে পারিনি। বলেছি ঐ নাট্যকাব ও অভিনেতা আমার বিশেষ পরিচিত। যখনই চাইব তখনই ফ্রি পাস পাব। তারা তখন আমায চ্যালেঞ্জ করেছে। আমি বলেছি তাদেব আটটি ফ্রি পাস এনে দেখাব। আশা করি তুমি আমার মান রাখবে। আমি জানি তুমি উদার মনেব পুরুষ। সংকীর্ণতার আঁধারে আজও তুমি বিলুপ্ত হওনি। আমি বর্তমানে মাসির বাড়িতে আছি। গত পরশু আমার মাসতুতো বোনের বিয়ে। তুমি ঐ দিন এসে থিয়েটারের পাশ দিয়ে যাবে।

ইতি ---

তোমার শ্রদ্ধা।

যার জন্য মরতে মরতে বেঁচে গেছি --- সেই মায়াবীর পত্রের মর্যাদা দেব না অগ্রাহ্য করব এমন প্রশ্ন মনের মাঝে দানা বেঁধেছিল।

শেষ পর্যন্ত প্রেমের জয় হল। এত অপমান সব ভুলে গেলাম। সরল বিশ্বাসে ওর মাসির বাড়িতে গিয়ে ঐ আটটি ফ্রি পাস ওর হাতে দিয়ে খেয়ে এলাম।

ঠিক তার তিনদিন পর বাড়ি ফিরে শুনি যে, ওরা আমাকে মারবার পরিকল্পনা করছে।

লাঠিতে ভর দিয়ে এক বৃদ্ধা, যিনি ওদের ভগ্নিপতির মা তিনি এসে সংবাদ দিলেন।

মা সব ঘটনা শুনে আমায় বকলেন। আমি এসব কথাকে আমল না দিয়ে স্টেশনে একটি মুদি দোকানে বসে গল্প করছিলাম।

হঠাৎ অষ্টম আশ্চর্যের আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। আমার অকৃত্রিম বন্ধু যে সেদিন বলেছিল -- সুব্রত মিথ্যা বলেনি। ঐ চিঠিগুলো আমার বোনের লেখা, কিন্তু সে অস্বীকার করলে আমি কি করব। বাবা মরা মেয়েকে তো আর বের করে দিতে পারি না? সেই হাবলু হঠাৎ আমার পরে চড়াও হয়ে ইতর ভাষায় বলল -- বল, আমার মাসি বাড়ি গিয়েছিলি কেন?

ওকে দু/তিনবার সরিয়ে দিলাম --- কিন্তু ও বেপরোয়া। বোনের দাদারূপে প্রতিষ্ঠা পেতে বদ্ধপরিকর। শেযে আমিও হাত চালালাম প্রকাশ্য রাজপথে। ও কেন এমন ক্ষিপ্ত হয়েছে তার ব্যাখ্যা দিলাম / আর অবাক হলাম এই ভেবে যে, এ সেই ছেলে, যে একদিন আমার বিবাহিতা পিসতুতো বোনের সঙ্গে রাত দুপুরে অবৈধ ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত অবস্থায় আমার কাছে ধরা পড়ে পা ধরে কেঁদেছিল কথাটা গোপন রাখতে। বলেছিল, এটা জানাজানি হলে ও আত্মহত্যা করবে। এ সেই ছেলে, যে তার বোনের প্রেমপত্র দেখে বিশ্বাস করেছিল যে, আমি একা দোষী নই।

ঘটনার এখানেই শেষ হল না। পাড়ায় এসে সে আমার অনুজের কাছে ইলেকট্রিক চাবুকের বাড়ি খেল। আর মার খেয়ে যে জামাইবাবুকে মূর্খ বলে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করত তার সহায়তায় কিছু দল বল নিয়ে আমার বাড়ি আক্রমণ করে কিন্তু বাধা পেয়ে ফিরে যায়।

পাড়ার সহযোগিতা না পেয়ে ওদের আস্ফলন থেমে যায়। পাড়ার অনেক মাতব্বর বাড়িতে এসে ভয় দেখায়। বলে চিঠি ঐ মেয়ের নয়। ওটা জাল চিঠি।

হবেও বা। আমার কোনো শত্রু বা অন্য কেউ হয়তো ওর হাতের লেখা নকল করে পাঠিয়েছে। ভাবলাম এরূপ চিঠি দিয়ে ঐ শয়তানী মেয়ে তার দাদার কাছে এটা প্রমাণ করতে চেয়েছে যে, সেদিনের চিঠিগুলি তার লেখা ছিল না। আর দাদাও ভাবে গদ গদ হয়ে বোনকে বোঝাতে চেয়েছিল যে, তোর জন্য আমি আমার প্রাণ পর্যন্ত দিতে পাবি।

নারীর বিশ্বাসঘাতকতার ছাপ মেখে আমি আবার ফিরে এলাম রঙ্গশালায়। নতুন নাটক লেখা শরু করলাম নাটকের নাম দিলাম ''কুহকিনী''--- কুহকিনীও নাম করল।

এগারো

সেই সময় একদিন।

কথা হচ্ছিল সুদীপ্তার ফ্লাটে সুদীপ্তার সঙ্গে।

কৃষ্ণচূড়ার শাখায় লাল ফুলের আভা। লজ্জায় রাঙা সুদীপ্তার মন। আধো শোয়া সুদীপ্তা আচমকা আমার একখানা হাত ধরে বলে -- সুব্রত, আমাদের অভিনয় কি বাস্তবে রূপান্তর হতে পারে না?

-- সুদীপ্তা, আমি একজন নারীর কাছ থেকে এমন ব্যবহার পেয়েছি যে, সেই জাতিকেই আর বিশ্বাস করতে পারি না।

-- আচ্ছা তোমার মা ও বোনও তো সেই একই জাত।

-- হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। মা-বোনও নারী জাতির মধ্যেই পড়ে। কিন্তু তাদের সঙ্গে অন্যদের পার্থক্য আছে। তারা শুধু দিতে চায়, দিয়ে পেতে চায় না। এরা কিন্তু শুধুই ভোগ করতে চায়। শরৎবাবু তার দত্তা উপন্যাসের এক জায়গায় লিখেছেন -- যে দেশের পুরুষের সামনে নারীরা ভাতের থালা ধরে পরমযত্নসহকারে পাখার বাতাস করে আহার করায় না, সে দেশের পুরুষেরা বড়ই হতভাগ্য। আজ আমাদের অবস্থা তাই। নারীদের কাছে পুরুষ ভোগের সামগ্রী ছাড়া আর কিছু নয়। যে তাদের শাড়ি, গহনা ও অর্থ দেবে, স্বাচ্ছন্দ্যে রাখবে, তত সে তার স্বামীর অনুগত হবে।

-- তা তুমি বলতে চাও যে, শাড়ি গহনার লোভ আগের নারীদের ছিল না? রামের ঘরণী সীতা বনে যাবার সময়ও অলংকার ত্যাগ করতে পারেনি। আর সোনার হরিণেও তার লোভ ছিল।

-- আরে তুমি তো দেখছি ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই নবরামায়ণের ক্যাসেটের কথা বলছ।

-- কথাটা তো আর অযৌক্তিক নয়। দেখো, একজনকে দেখেই তুমি সমগ্র নারীজাতিকে বিচার করবে এটা ঠিক নয়।

-- দেখো, আমি যদিও থিয়েটারের বই লিখছি, অভিনয় করছি। সে নাটক জনপ্রিয়ও হয়েছে। তবে সে সুনাম এতদূর প্রসারী নয় যে, আমি এ যুগের বিখ্যাত নট-নটীদের মতো হতে পেরেছি। আর পরিচিত বন্ধুরা আমায় দেখে কি বলে জানো?

-- কি বলে?

-- বলে, তোকে দেখবার পর আমাদের নাট্যকার দেখার সাধ মিটেছে।

-- এ কথার অর্থ?

-- এ কথার অর্থ হল, আমার মতো লোক যে এজায়গায় আসতে পারে তা তারা বিশ্বাস

করতে পারছে না। তারা আমার 'মাতা শত্রু' নাটক দেখে কি বলেছে জানো?

-- কি বলেছে?

-- বলেছে, হিন্দি স্টাইলটা পাল্টা।

-- তা তাদের জিজ্ঞাসা করলে না কেন, বাংলা স্টাইলটা কি? বাংলা স্টাইল বলতে তারা কি বলতে চাইছে?

-- যারা একথা বলে তারা কমার্শিয়াল কোনো কাহিনি পছন্দ করে না। তাদের কাহিনিতে থাকবে --অনাহার, অনটন, দুর্ভিক্ষের কথা। থাকবে অন্যায় - অবিচার ও অত্যাচারের দৃশ্য। জমিদার তাদের গ্রামে জল্লাদের ভূমিকা নিয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের মোড়ল গ্রামে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে বেশি পয়সায় তাদের বীজ থেকে অন্যান্য জিনিস দিয়ে শোষণ করছে এসব দৃশ্য থাকবে। তার সঙ্গে থাকবে সেক্স। সেখানে কোনো প্রতিকারের কথা থাকবে না। থাকবে না কোনো উপদেশ, থাকবে না কোনো তুলনা। প্রগতি বা অগ্রগতির কোনো নমুনা না দেখিয়ে থাকবে শুধু বড় বড় বক্তব্য। কিছু কেচ্চা।

-- যেমন?

-- শোনো তবে আধুনিক নাটকের ডায়লগ।

চায়ের দোকানে অমিতাভ বচ্চন বা মিঠুন চক্রবর্তীর মতো চুলের ছাঁট যুক্ত কোনো ছেলে ঢুকল। ও পাশ থেকে একটি ছেলে হাঁকল -- হ্যাঁরে নবা, এতদিন কোথায় ছিলি?

-- কোথায় আবার বাড়িতে।

-- তুই বাড়িতে! এ আমায় বিশ্বাস করতে হবে?

-- কি করব বল, বেকার হয়ে পড়েছি।

-- তুই আবার সাকার ছিলি কবে যে, আজ বেকার হয়ে পড়লি?

-- আরে বাজার সরকারের পোস্টটা তো হাতে ছিল?

-- তা সেই পোস্টটা খালি হল কি করে?

-- বাবা, রিটায়ার করে শরীরটাকে ফিট রাখতে সে দায়িত্ব নিজেই নিয়েছে।

-- তাহলে বল, তোর বাবা এক জায়গা থেকে রিটায়ার করে অন্য জায়গায় জয়েন্ট করেছে।

-- তা বলতে পারিস।

-- তাহলে তো তোকে আজ চা খাওয়াতে হবে।

-- খাওয়াতেই যে হবে, এমন কোনো মাথার দিব্যি নেই।

-- শুধুই কি গদ্য ডায়লগ চলে? পদ্য নেই? সুদীপ্তা প্রশ্ন করে।

-- আছে। এবার দুটি গার্লফ্রেণ্ডের ডায়লগ শোনো।

-- হাই টিনা -- কোথায়?

-- একটু নিউ মার্কেটে।

-- না, মানে জনের আজ বার্থ ডে কীনা।

-- তা তোদের এনগেজমেন্টের পার্টি কি আজই হচ্ছে?

-- তেমন কোনো ইচ্ছে নেই। যদি কখনো হয়, তুই আমন্ত্রিত হবি। মিত বিনা প্রীত হয়-না-বুঝলি?

-- তা তুমি দেখছি মডার্ণ এজের পরে ভীষণ চটা? সুদীপ্তা মৃদু হেসে বলে।

— ঠিক চটা নয় -- ন্যাকামো বা নকল রীতিনীতিতে আমি বিশ্বাসী নই। একদিকে ছেলেরা বলছে তারা গতির যুগে বাস করে। সবকিছু রকেটের গতিতে চলবে। তারা তাই রক-এ্যাণ্ড-রোলের রেকর্ড কেনে, টি. ভি, ফ্রিজ, টু-ইন-ওয়ান কেনে এ্যারিস্ট্রোক্রেসি প্রমাণের জন্য। এক শ্রেণির লোক আবার আধুনিক বাংলা গানকে প্যানপ্যানানি আখ্যা দিয়ে রবীন্দ্র- সঙ্গীত কেনে, রবীন্দ্র রচনাবলী কিনে আলমারিতে সাজিয়ে রাখে। কোনো লোক এলে গান বাজিয়ে শোনায়/আমি এমন লোকও দেখেছি তারা বাড়িতে রেডিও বাজলে বলে-- ঐ ব্যাজর ব্যাজর বা ঘ্যানঘ্যানিটা বন্দ করো তো। আবার সেই লোকই ছেলের জন্য মেয়ে দেখতে গিয়ে বলে --- মা, তুমি রবীন্দ্রসঙ্গীত জানো? আমি আবার ওটা খুব ভালোবাসি। এরা কিন্তু গদ্যপদ্য নয়। আমরা বাঙালি। নরম মাটির মানুষ। আবেগ প্রবণ কোনো জিনিস দেখতে বা মিষ্টি মধুর প্রণয় কাহিনি শুনতে বা দেখতে ভালোবাসি। আর যে কাহিনি যাত্রায় বা কিছু কিছু সিনেমায় অহরহ হচ্ছে। তাতেই পয়সা আসছে। শিল্প বা বাঙালি সংস্কৃতি বেঁচে আছে। আর পুরস্কার পাওয়া ছবি তৈরির দিকে যদি সকলে ঝুঁকত তবে এইসব কলা কুশলীরা না খেয়ে মরত। কারণ ছবিগুলি ভারতের দারিদ্র্য, দৈন্যপীড়িত অবক্ষয়ের দৃশ্য দেখিয়েছে।

এদিকে আমরা বলব রকেটের যুগের লোক আর আচার-আচরণ, ঘর-গৃহস্থীতে পৌরাণিক আচরণের ধারাকে বজায় রাখব, তা কি করে হবে?

— তা, তুমি এর দ্বারা কি বোঝাতে চাইছ বলো তো?

-- পরিষ্কার গদ্য কথা হল -- তুমি আমার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে অভিনয় করতে করতে আমাকে ভালোবেসে ফেলেছ বা মনে করেছ, আমার সঙ্গে তোমার বনিবনা হবে, ঘর সংসার করতে পারবে। কিন্তু সে বিষয়ে তোমাকে কয়েকটি বাধার সম্মুখীন হতে হবে।

— সেটা কি?

-- তুমি একজন অভিনেত্রী। এখনও বহু ফ্যামিলিতে অভিনেত্রীকে বধূ বলে মেনে নেওয়া হয় না। আর সবচেয়ে বাস্তব হল দুজন সমভাবাপন্ন লোক যদিও একসাথে বাস করতে পারে কিন্তু দুজন একই প্রফেশনের শিল্পী এখনও একসঙ্গে বেশিদিন থাকতে পারে না।

-- কেন বলিউডের দেবানন্দ -- কল্পনা কার্তিক, শাম্মীকাপুর -- গীতাবলী, প্রেমনাথ --

বীনারাই, অমিতাভ -- জয়া, মিঠুন -- যোগিতাবালি, এরা কি একসঙ্গে থাকেনি ?

-- থেকেছে সেক্ষেত্রে নায়িকারা তাদের প্রতিভার গলা টিপে হত্যা করেছে। তারা তাদের অতীতকে তুচ্ছ করে বর্তমানকে ধরেছে। তোমার মনে যদি কখনো রাজেশ খান্নার বৌ ডিম্পলের মতো মনে হয় যে, তোমার প্রতিভার বিকাশে বাধার প্রাচীর আমি, তখন কি হবে? তার চেয়ে তোমার মনের গভীরে যদি এখনও তেমন কোনো গভীর প্রেমের ক্ষত না হয়ে থাকে -- তবে ওসব চিন্তা ছেড়ে দাও।

-- আমি সব ছাড়তে পারব, কিন্তু তোমাকে ছাড়তে পারব না। আমি পরিষ্কার গদ্যে আমার মনের কথা ব্যক্ত করলাম। এবার তুমি আমায় গ্রহণ করবে না ত্যাগ করবে সে তোমার বিষয়।

-- আরে এ যে যাত্রার সংলাপ হয়ে গেল। কনভেন্টে পড়া মেয়েরা যে আবার এ ডায়লগ পছন্দ করবে না। আমি ঠাট্টার সুরে বললাম।

-- এ যাত্রা থিয়েটারের সংলাপ নয় সুব্রত। এ সত্যিকারের সংলাপ।

-- এ জন্য কিন্তু তোমাকে অনেক দুঃখ, অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

-- আমি প্রস্তুত।

-- বেশ, আমি কামনা করি তুমি প্রণয়ে জয়ী হও।

-- এ যে পৌরাণিক ছবির সংলাপ হল।

-- তাহলে, আধুনিক করে বলছি। আমি জানি না তোমায় ভালোবাসি কীনা বা জীবনে কাউকে প্রকৃত ভালোবাসতে পারব কীনা কিন্তু তবুও তোমার ভালোবাসার মূল্য দেব।

ভাবাবেগে, আনন্দের অতিশয্যে অভিনেত্রী সুদীপ্তা আমার ঠোঁটের স্বাদ নিল।

বারো

বাংলা বনধের জন্য থিয়েটার বন্ধ।

থিয়েটারের মালিকের আমন্ত্রণে সুদীপ্তা এবং আমি বকখালিতে বেড়াতে গেলাম। সেখানে হৈ চৈ করে কাটল তিনজনের।

সুদীপ্তা, সবুজ ও আমার সঙ্গে এমন আচরণ করল যাতে কেউ অসন্তুষ্ট না হয়।

সবুজ আজ যেন সুদীপ্তার সঙ্গে একটু বেশি ফ্রিলি কথা বলল। বার বার বিশেষ ভাবে বিশেষ ভঙ্গিমায় ছবিও তুলল। তার রূপ ও গুণের একটু বেশি প্রশংসা করল। রাতে ওখানেই রাত কাটাবার প্রবল ইচ্ছা ছিল সবুজের কিন্তু সুদীপ্তা রাজি না হওয়ায় আমাদের ফিরে আসতে হল।

* * *

এরপর কেটে গেল আরও কিছুদিন।

আমি তখন স্বপ্ন দেখছি -- আবারও ফানুস উড়িয়েছি আকাশে। আমি জানি আমার বাডির লোকেরা এটাকে স্বীকৃতি দেবে না। সুদীপ্তাকে তাই বলেছি আপাতত আমরা তার ফ্ল্যাটেই থাকব। তারপর যদি আমাদের ঘরে নতুন আগন্তুক আসে, তবে তার সৌজন্যে হয়তো আমাদের সঙ্গে পরিবারের লোকদের সম্পর্ক সহজ হবে।

শ্রদ্ধার বেইমানীতে বিষিয়ে গিয়েছিল আমার দেহ মন। তাই নারীর সব কিছুকে আমি অভিনয় ছাড়া ভাবতে পারি না।

আমি আমার সবটুকু দিয়ে জেনেছি যে, আমরা যাদের অবলা, সরলা মায়া মমতার আধার বলে জানি, তারা আসলে তা নয়। দুষ্টু ছেলেকে বা একটু বদরাগী যুবকদের বা মোটা মাইনের চাকুরেদের বা বড় পদের ব্যক্তিদের যেমন আমরা তোযামোদ করে চলি, তারা বিগ্‌ড়ালে আমাদের ক্ষতি হবে ভাবি এও ঠিক তাই। তাদের ভোগের সামগ্রী'রূপে চিহ্নিত করে তাই কিছু লোক তাদের তোযণ করেন। কিন্তু আমার ধারণাটাই তো সব নয়। কারণ এদের নিয়েই তো কাব্য-কাহিনি -- কবিতার সৃষ্টি। এদের জন্যই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, ট্রয় নগরী ধ্বংস, লঙ্কার রাবণের সবংশে নিধন। বিশ্বের যত মহাকাব্যের কাহিনি তো এদের নিয়েই। আর সকলে যে শ্রদ্ধা হবে তার মানে কি?

আজও রাতে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায় আর নিজের মনে প্রশ্নজাগে -- শ্রদ্ধা সেদিন কেন মিথ্যা বলল? আর সব ঘটনার অবসান হবার পর আমাকে সে চিঠি লিখল কেন? সকলে বলেছে ঐ চিঠি জাল ছিল। ও হাতের লেখা তার নয়। তবে কে এই চিঠি লিখল? এরপর আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল। পাড়ার এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাড়িতে অশ্লীল শব্দ পেস্ট করে কে যেন পত্র দিয়েছিল। যার জন্য আমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। সেদিনও

আমি জন সমর্থন পেয়েছিলাম। আমার এক বিশেষ বন্ধু কথা দিয়েছিল যে, এটা অনুসন্ধান করে বের করবে। কিন্তু সেও হাবলুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে।

সবই রহস্য -- সবই কুয়াশা। শ্রদ্ধার সহানুভূতি ও ভালোবাসা আবার বেইমানী, জাল চিঠি, এসব মাথায় জট পাকিয়ে যখন অস্থির করে তুলত, তখন ঘুমের বড়ি না খেয়ে ঘুমতে পারতাম না।

আজ বেশ কিছুদিন হল সেই অনিদ্রাটি বিদায় নিয়েছে। আমি দিব্যি অভিনয় ছেড়ে লিখছি। দিনান্তে সুদীপ্তাকে কাছে পাচ্ছি। তার দেহের অনেকটা স্থানের স্পর্শ পাচ্ছি। ভুলতে বসেছি শ্রদ্ধার বেইমানীকে।

শ্রদ্ধাকে নিয়ে মাঝে মাঝে সৎচিন্তা করি। তার বেইমানীকে একটা সুষ্ঠ রূপ দিতে চেষ্টা করি। ভাবি সে তো বলেছিল আমি সময়মতো তোমার কাছে আসব, তুমি আমাদের বাড়িতে যাবে না। আমি কেন আমার বৈরীদের প্ররোচনায় ওদের বাড়িতে ওর চিঠি নিয়ে গেলাম? তাতে ওর রাগ হতে পারে। আর ওর দাদা ও মা যখন ওকে সোজাসুজি আক্রমণ করে তখন সাময়িক আত্মরক্ষার জন্য ওকে একাজ করতে হয়েছিল। এতটা সিরিয়াস হবে তা ও ভাবেনি।

এরপর পরীক্ষা দিতে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গিয়ে ও আর একবার প্রমাণ করেছিল যে, ওর ভালোবাসা, সহানুভূতি, আমার বিষয়ে ভাবনা চিন্তা মিথ্যা ছিল না। পাড়ায় যেসব বন্ধুরা ওর বিষয়ে আজে বাজে বলে আমার কান ভারি করেছিল --তাদের অন্য উদ্দেশ্য ছিল।

এসব ভাবনা-চিন্তা বেশিদূর এগোবার আগেই বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেছে। ও স্টাফ্ নার্স হয়েছে, এ ঘটনার ন বছর পরে একদিন আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু বলল -- আজ শ্রদ্ধার বিয়ে -- কি দেওয়া যায় বল তো?

-- কি দিতে চাস?

-- একটা বই দেবার ইচ্ছে।

-- আমি চয়েজ করে ওকে একটা বই কিনে দিলাম। বুকের ভিতরটা এতদিন পরেও যেন কেমন মোচড় দিয়ে উঠল। বেদনা ভুলতে পরপর তিনটে ছবি দেখে বাড়িতে ফিরলাম। বাড়ির কেউই সেদিন আমায় কিছু বলল না। এ বেদনার সাক্ষী কেউ থাকল না।

বিনা আড়ম্বরে শ্রদ্ধা বিয়ে করে চলে গেল। কেউ বলল, ওর স্বামী হাসপাতালের ক্লার্ক, কেউ বলল হাউস সার্জন, কেউ বলল হেলপার, কেউ বলল লাভ ম্যারেজ।

এসব চিন্তা কেন যে, বার বার মাথায় আসে বুঝে উঠত পারি না। এখন তো আমি সুশ্রী তন্বী সুদীপ্তার প্রেমিক।

এরূপ দুঃস্বপ্ন ও সুস্বপ্নে যখন সময় অতিবাহিত হচ্ছিল, ঠিক তখন একদিন আমার অর্থনৈতিক কাঠামো, যশ ও প্রতিষ্ঠার অধিকর্তা সবুজ সেন আমায় ডেকে পাঠাল তার বেডরুমে।

আমি ঢুকতে যেতে সুদীপ্তাকে তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম। তার হাতে একটি প্যাকেট।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম--কিগো, বস আমায় ডেকেছ কেন?

-- তা, আমি কি করে জানব? তোমার বন্ধু তুমি জানবে।

-- তোমার হাতে ওটা কি?

-- একটা শাড়ি। উনি ওনার বোনের জন্য এনেছিলেন, তার পছন্দ নয় তাই আমাকে গছালেন।

-- গছালেন নয় -- বলো প্রেজেন্ট দিলেন।

-- তা আমায় প্রেজেন্ট করবেন কেন?

-- কেন, এই জন্য যে, প্রাণ দিয়ে তার বইয়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে, তার ঘরে মা লক্ষ্মীর কৃপা হবে।

-- আর নাট্যকার? তার বুঝি কোনো দাম নেই? সে সংলাপ না লিখলে আমরা বাহবা পাব কি করে? আসল কারিগর তো তোমরা।

-- ওসব তো কথার কথা। অমিতাভ বচ্চন তো সুপারস্টার তার রেট নাকি তিন কোটি টাকা। বিশ্ব জোড়া তার নাম। শতাব্দীর সেরা নায়ক হয়েছেন তিনি মেঘাস্টার তিনি পেয়েছেন ফরাসির শ্রেষ্ঠ নাগারিক পুরস্কার লিজিয়ন অফ অনার। কিন্তু যে বইতে যার ডায়লগ বলে তিনি সুপারস্টার হলেন, দিবার বা শোলের সেই রাইটার সেলিম জাভেদকে কজন চেনে বা জানে? তাঁদের রেট কত? আমাদের দেশে লেখকের মূল্য কোথায়? বই চললে প্রকাশকদের কাছে তার আদর। না চললে তাকে পেপার বাস্কেটের কাগজের মর্যাদাও কেউ দেয় না। নাট্যকারের বই বকস অফিস পূর্ণ করতে পারলে তার নাটকের মূল্য হয়, না হলে তাকে অশেষ দুঃখ ভোগ করতে হয়। যেমন এখনকার নাট্যকার ও ঔপন্যাসিকদের হচ্ছে। ভালো কভার করে, হাজার হাজার টাকার বিজ্ঞাপন দিয়ে ৫০%কমিশনের পরে কিছু দিয়ে তবে তাদের বই চলেছে। কারও আবার তিন/চারখানা বই একসাথে ছেপে ৭৫% কমিশনে দেওয়া হচ্ছে/এককালে এদের দেমাকে মাটিতে পা পড়ত না। ৫০% কমিশনে যাদের বই বিক্রি হোত তাদের এরা বলত বটতলার লেখক। আজ এদের এর চেয়েও হীন অবস্থা। তবুও এদের নিয়ে সভা-সমিতি হয়। এরা কাউকে তোলেন না, কাউকে সহ্য করতে চান না; বরং যদি কোনো লেখক নতুন চিন্তাধারা নিয়ে লেখেন, তখন এরা তাদের দমিয়ে দেবার জন্য তাদের তৈরি একটি কাগজ ও একটি পত্রিকায় নানারূপ টিকা -টিপ্পনী কাটেন। আর ঢেঁকুর তোলা কিছু আঁতেলরাই সেগুলিকে বেদ বাক্য বলে মনে করে।

এরা সুনীল গাভাসকারের সঙ্গে কপিল দেবের, শচীনের সঙ্গে সৌরভের বিরোধ বাধায়, হেমন্ত-মান্নার তুলনা করে, উত্তম-সৌমিত্রকে নিয়ে, অমিতাভ-মিঠুনকে নিয়ে বিতর্কের

ড় তোলে আর বেকার এক শ্রেণির লোক চায়ের দোকান -- ট্রেনের কামরায়, বাড়ির রকে বসে কে কার থেকে বড় তা নিয়ে প্রথমে তর্ক, তারপরে দ্বন্দ্ব, তারপরে হাতাহাতিতে লিপ্ত হয়।

-- বাব্বা, তোমার সঙ্গে লেকচারে পারা যাবে না। যাও, এসব ছেড়ে শহিদ মিনারের তলায় গিয়ে ভাষণ দাও -- লোক জমাতে পারবে।

-- এটা আবার সবাই পারে না। আচ্ছা যাই দেখি আমার বস কি বলে?

-- কি বলে আমায় বলো কিন্তু।

-- আচ্ছা।

বেশ কিছু সময় পরে সবুজের ঘর থেকে যখন বের হয়ে এলাম তখন আমার চোখ দুটোতে জল টলটল করছে। পা দুটো যেন নিজের বশে থাকছে না। কোনো রকমে দেহভার সামলে বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করলাম। সারাদিন আর ঘরের বার হলাম না।

আজ আবার দুটি শো। অভিনয় করতে হবে।

প্রস্তুত নিলাম।

অভিনয় চলাকালীন হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে মাথা ঘুরে কাত হয়ে পড়লাম এক টুকরো কাঠের মধ্যে। টুকরোটা চোখের মধ্যে ঢুকে গেল। জ্ঞান হারাবার আগে মনে করেছিলাম মৃত্যু আমাকে স্পর্শ করছে। আর বুঝি মায়ের ছেলে মায়ের কাছে ফিরে যেতে পারলাম না।

কিন্তু না। মরলাম না। চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় আমাকে আবিষ্কার করলাম একটি নার্সিং হোমের কেবিনে।

প্রতিদিন সুদীপ্তা এসেছে, আমার কুশল জিজ্ঞাসা করেছে। স্নেহকরপল্লব ললাটে স্পর্শ করেছে। সবুজও এসেছে। থিয়েটারের শো বন্ধ না রাখার এবং নতুন নায়ক নেবার কথা বলতে সে আমায় ধমক দিয়েছে। বলেছে যদি তোমার কিছু হয়, তবে আমি থিয়েটার বন্ধ করে দেব।

আমি জিজ্ঞেস করি -- ডাক্তার কি বলেছে? দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাব তো?

-- পাবে।

পরে এলো সেই পটি খোলার দিন। দীর্ঘ একমাস বাদে পৃথিবীর আলো দেখতে পাব। আশা যে সুদীপ্তাকে প্রথমে দেখব।

সবুজ আমার হাত ধরে বসে উৎসাহ দিচ্ছে। আমার জন্য ও যা করেছে তার তুলনা নেই। অবশ্য তার বিনিময়ে ও আমার কাছে যা চেয়েছে তার মূল্য অনেক কিন্তু আজ মনে হচ্ছে কিছু নয়।

চোখ আস্তে আস্তে খুলছি ডাক্তারের নির্দেশক্রমে প্রথমে অন্ধকার পরে আবছা আবছা এবং পরে স্পষ্টতব হল সব দৃশ্যগুলি।

আমি আনন্দের আতিশয্যে জড়িয়ে ধরলাম সবুজকে। সবুজ আমি সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

সবুজ আমার হাত দুটোতে আরও জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল -- আমি বলেছিলাম না, এটা সাময়িক। তুমি দেখতে পাবে।

সুদীপ্তা কাছে এগিয়ে এলো। তার হাতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধার স্টিক ও একটি বৃন্তযুক্ত লাল গোলাপ। রজনীগন্ধার স্টিকটি পাশে রেখে লাল গোলাপটি আমায় দিতে গিয়ে চিৎকার করে ছুটে বেরিয়ে গেল সুদীপ্তা -- ও নো -- নো বলতে বলতে।

আমি কিছু বুঝে উঠতে না পেরে সবুজকে জিজ্ঞাসা করলাম -- কিরে সবুজ ও অমন করে চলে গেল কেন?

-- তোমার একটি চোখের ক্ষত এখনও সারেনি। তাই ও ঐ দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে চলে গেছে। আসলে কি জানো, ওর মনটা খুব নরম আর খুব শৌখিনও। কুৎসিৎ কিছু ও দেখতে পারে না।

সুদীপ্তা আর এলো না। আমি নার্সিং হোম থেকে ছাড়া পেয়ে যেদিন বাড়ি ফিরলাম সেদিনই সবুজ একটি পার্টি দিল। আমি ভেবেছিলাম আমার আরোগ্য লাভের অনারে।

কিন্তু আমার সে ভাবনার বুকে পেরেক ঠুকে সেদিনই সুদীপ্তার হাতে এন্‌গেজমেন্ট রিং পরাল সবুজ।

সেদিন যখন সবুজের বেডরুমে তার আমন্ত্রণে আমি গিয়েছিলাম, সেদিন সে আমায় তার মনের কথা বলেছিল। আমি দোটানায় পড়েছিলাম। সবুজ আমাকে প্রতিষ্ঠিত করতে অনেক কিছু করেছে। তার মনের আশা পূরণে আমারও যত্ন নেওয়া উচিত। কিন্তু নিজের প্রিয়তমাকে অপরের হাতে তুলে দেব কি করে? কি করেই বা এ প্রস্তাব দেব?

আমাকে আর অপ্রিয় কাজটুকু করতে হল না। কানার সঙ্গ ত্যাগ করল সুদীপ্তা। বুঝলাম এই একমাসের ভিতর ও তিন বছরের সব কিছু ধুয়ে মুছে ফেলেছে।

এরপর ফিরে এলাম বাড়ি। থিয়েটার ছেড়ে দিলাম। লেখা শুরু করলাম।

তারপর কেটে গেছে বহুদিন। বিয়ের কথা হলে বাড়ি ছাড়ি। বাকি সময় বাড়ি থাকি।

এরপর আবার একবার নারী চরিত্র যে অতিশয় দুর্বোধ্য তার প্রমাণ পেলাম।